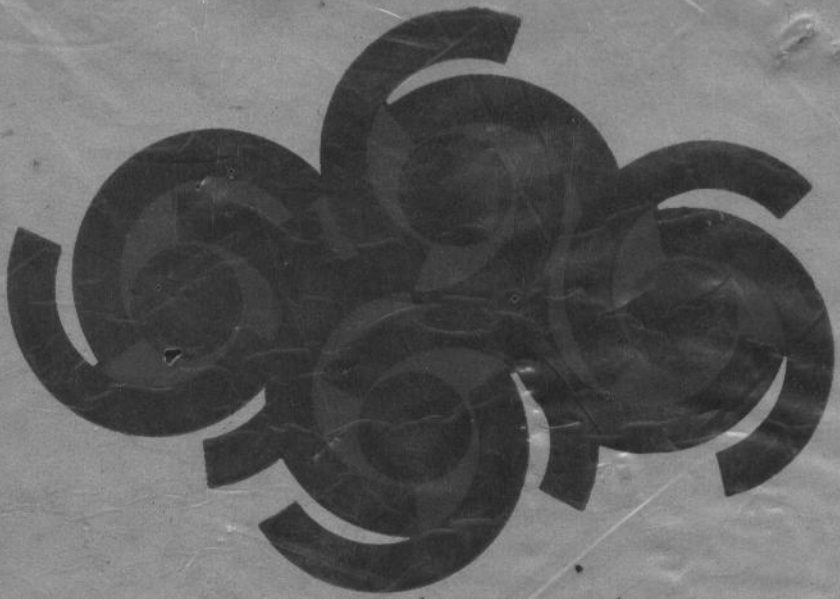

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ধাঁধা নিয়ে মজার খেল

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

হেঁয়ালি

এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যা শুনলে প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, এ অসম্ভব, অবাস্তব, এর কোনো উত্তর নেই, উত্তর হয়ও না। আবার এমনও প্রশ্ন দেখা যায়, যার উত্তর নিয়ে এমনিতে কোনো সন্দেহ হয় না, কিন্তু মজা এইখানেই যে, উত্তর যেটা ঠিক মনে হয় আসল সমাধান সেখানে নয়।

এইসব ক্ষেত্রে যেখানে প্রশ্ন দেখায় অবাস্তব কিম্বা উত্তর হয় অর্থহীন, সেখানেই আসে হেঁয়ালি। হেঁয়ালি এমন একটা বস্তু যেটা সহজ নয়, অথচ মনে হয় সহজ। যে প্রশ্ন ঠিক বা যে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর আছে, তা যদি কঠিনও হয়, তবু কোমর বেঁধে চেষ্টা করা যায়, সে প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু যে প্রশ্ন দেখায় গোলমেলে অর্থাৎ সরষের মধ্যেই যার ভূত আছে মনে হয় কিম্বা যার উত্তরের মধ্যে সত্যিই ভূত রয়েছে, এমন প্রশ্নকে এড়িয়ে চলাই বোধহয় ভাল। কিন্তু এড়িয়ে চলি সাধ্য কি!

হেঁয়ালির একটা টান আছে। সেই টানের মোহপাশ থেকে চট করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। নিষেধ করে উপদেশ দেওয়ার ফল অধিকাংশ সময়েই হয় মারাত্মক। শুধু মনে হয়, নিষেধের বেড়াজালকে অতিক্রম করে যাই, বাইরে কি আছে উঁকি মারি। নতুনকে চিনি, জানি, বুঝি। কৌতূহল তো মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে।

হেঁয়ালি শুধু আপাত অবাস্তব প্রশ্নের সঙ্গে উত্তর বা উত্তরহীন সহজ প্রশ্ন নয়, কখনো কখনো বিবৃতি মাত্রও বটে। এই বিবৃতিটি অদ্ভুত। এর মধ্যেই আছে একটা পরস্পর বিরোধী ভাব যা আমাদের সবাইকে ভাবায়। ভাবায় এবং অস্থির করে। প্রশ্নের অসঙ্গতি

আমরা খুঁজে বের করবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলি, সচেষ্ট হই। এই চেষ্টায় আজ বিজ্ঞানীরাও অংশ নিয়েছেন।

প্রথমে একটি অতি প্রচলিত হেঁয়ালির কথা বলা যাক। গল্পের আকারে এটিকে সাজানো হয়েছে।

দশজন ক্লান্ত পথিক একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছোল। ছোট সরাইখানা, কিন্তু উপায় কি! ঝোড়ো রাত, চারিদিক অন্ধকার। সরাইখানার মালিক বলল, এখানে খালি আছে এখন মাত্র ন'টা ঘর। প্রত্যেকটাই সিঙ্গেল সিটেড। আর নেই। এক ঘরে দুটো বিছানা ফেলবে সে জায়গাই বা কোথায়! ঘরের এমন অবস্থা। এক কাজ করা যেতে পারে। আটজন আটটা ঘরে ঢুকুক। আর অন্য ঘরটায় দুজন, একই বিছানায়। একটা রাত একটু কষ্ট করে কাটাতে হবে।

কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেল এ থেকে। ক্লান্ত পথিকদের কেউই এক বিছানায় দুজন উঠতে রাজি হলো না। মুসকিলে পড়ে গেল সরাইখানার মালিক।

অবশ্য চালাক লোক সে। অবস্থাটা শীগ্‌গিরই সামলে নিয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় সে পথিকদের খুশি করার মত ব্যবস্থা করল।

খালি ন'টা রুমকে নাম দেওয়া যাক, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ। মালিক বলল, প্রথমে ক রুমে ঢুকুক দুজনে। তৃতীয় জন খ রুমে, চতুর্থ জন গ রুমে, পঞ্চম জন ঘ রুমে, ষষ্ঠ জন ঙ রুমে, সপ্তম জন চ রুমে, অষ্টম আর নবম ছ আর জ রুমে। এখন খালি পড়ে থাকছে ঝ রুম। এদিকে ক রুমে আছে দুজনে। যার বিছানায় জায়গা হয়নি, সে দশম জন বা শেষ জনই। তাকে তুলে এনে রেখে দিলেই হবে ওই ঝ রুমে। তাহলে নটা সিঙ্গেল সিটেট রুমে ১০ জনেরই জায়গা হলো। এক বিছানায় কোনো দুজন নেই। এটা অবাক হওয়ার মত একটা ব্যাপার নয় কি!

এটি একটি হেঁয়ালি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটি বৃটিশ ম্যাগাজিনে (কারেন্ট লিটেরাচার, দ্বিতীয় খণ্ড, এপ্রিল ১৮৮৯) এটি

প্রকাশিত হয়েছিল একটি কবিতার আকারে। কিন্তু মূল হেঁয়ালিটি তার চেয়ে অনেক আগের।

হেঁয়ালিটি কি রকম? আপাতদৃষ্টিতে এটি অসম্ভব, অর্থহীন। ৯টি ঘর, ১০ জন মানুষ এক একটি ঘর পাবে তা তো হতেই পারে না। কিন্তু হেঁয়ালি আর বিন্যাসের কায়দায় তা সম্ভব হলো।

হেঁয়ালি অনেক রকমের হয়, অনেক জাতের। সব হেঁয়ালিতেই গাণিতিক ব্যুৎপত্তি থাকবে এমন নয়।

দুই বাপ আর দুই ছেলে শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। তাতে শহরের লোকসংখ্যা যা ছিল তা থেকে মাত্র তিনজন কমে গেল। কি করে এ রকমটা সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? বাপ, ছেলে আর নাতি এই তিনজনই দুই বাপ আর দুই ছেলে। আর সেইটুকু নিয়েই এই হেঁয়ালির সৃষ্টি।

বাংলার লোকসাহিত্যেও এ-রকম একটি প্রহেলিকা আছে:

এরা বাপ বেটা, ওরা বাপ বেটা
তালতলা দিয়ে যায়,
একটি তাল পড়লে পরে
সমান ভাগে খায়।

কি করে একটি তাল সবাই মিলে সমান ভাবে ভাগ করে নিচ্ছে?

একটা তালের তিনটে আঁটি আর ওদিকে আছে তিনজন। ভাগ করায় অসুবিধে হবে কি?

'অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যান্ড' রচয়িতা লিউইস ক্যারোলের কিছু সুন্দর হেঁয়ালি আছে।

যদি দুটো ঘড়ি আমার কাছে আনা হয়, তাহলে কোন্ ঘড়িটাকে আমি নেবো? যেটা ভাল সময় দেবে নিশ্চয় সেটাই। কিন্তু দুটো

ঘড়ির একটা যদি দিনে ১ মিনিট স্লো যায়, আর একটা যদি একদম না চলে তাহলে ?

সাধারণ বুদ্ধি থেকে এ কথাটা নিশ্চয়ই বোঝা যায়, যে ঘড়িটা দিনে এক মিনিট স্লো যায়, সেই ঘড়িটাই বেশি কাজে দেবে আমার। কিন্তু সঠিক সময় তাতে কতটুকু পাওয়া যাবে ? দিনে এক মিনিট, তার মানে একবার ঠিক সময় ধরে চালিয়ে দিলে ১২ ঘণ্টা স্লো যাবার আগে পর্যন্ত তাতে আর ঠিক সময় পাওয়া যাবে না। ১২ ঘণ্টা হলো ৭২০ মিনিট। দিনে এক মিনিট বলে ৭২০ মিনিট স্লো যেতে লাগবে ৭২০ দিন। অর্থাৎ বলতে গেলে দুবছরে সে একবার দেয় সঠিক সময়। এ ঘড়ি ভাল কি ? অথচ যে ঘড়িটা একদম চলে না, তা দিনে দুবার ঠিক সময় তো নিশ্চয়ই দেবে। যদি সে ঘড়িতে আটটা বেজে দশ হয়ে থাকে, তাহলে সকালে একবার আটটা দশ মিনিটের সময়ে ঠিক সময় পাচ্ছি, রাত আটটা দশেও তাই। তবু এ রকম ঘড়ি পয়সা দিয়ে কে কিনবে ?

এ হেঁয়ালির সমাধানে কেবল মাথা চুলকোনো ছাড়া আর কোনো উপায় তো দেখি না।

এ-রকম আর একটি হেঁয়ালি আছে যা খুবই প্রচলিত। আগের হেঁয়ালির মত এটিও মনকে যথেষ্ট নাড়া দেয়।

কোনো শহরে একজন নাপিত আছে এবং একজনই। তাহলে যারা নিজেরা দাড়ি কামায় না, তাদের সকলের দাড়িই সে কামায়। আর যারা নিজেরা দাড়ি কামায়, তাদের দাড়ি তাকে কামাতে হয় না।

এরকম অবস্থায় তার নিজের দাড়ি কামানোর ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে ? সে যদি তার নিজের দাড়ি নিজেই কামায়, তাহলে যুক্তি যা বলে, তাতে তার নিজের দাড়ি নিজে কামানো উচিত নয়। আর যদি তার নিজের দাড়ি নিজে না কামায়, তাহলে তো নিজের দাড়ি তার নিজেরই কামানো উচিত।

ব্যাপারটা যে অসম্ভব গোলমেলে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দাড়ি কামানো নিয়ে অনেকটা এই রকমই আর একটা হেঁয়ালি আছে। একজন খেয়ালি লোক একটা ছোট জায়গায় এসেছে। হাতে কিছু সময় আছে, চুলটা কেটে নেওয়া যেতে পারে। কোথায় চুল কাটবে? ওখানে আছে দুজন নাপিত, তাদের দুজনের দুটি চুল কাটার দোকান। একটি দোকানে উঁকি দিয়ে খেয়ালি লোকটি দেখলো, ভেতরের চেহারাটা একদমই ভাল নয়, নোংরা, ময়লা, নাপিতের দাড়িও কামানো নেই, চুলটাও বাজে ভাবে কাটা। কার ইচ্ছে করে এই ধরনের নাপিতের কাছে এই রকমের দোকানে ঢুকে চুল কাটতে? অথচ অন্য দোকানটায় ঢুকে দেখা গেল, ঝকঝকে তকতকে। তাকালেই ভাল লাগে। নাপিতকে দেখেও মন খুশি হয়, চুল কাটতেও কোনো আশঙ্কা থাকে না। দাড়ি নিখুঁত কামানো, চুলের কাটতিও পছন্দ মতো। এই দোকানটিতেই ঢুকতে মন চায়।

কিন্তু খেয়ালি লোকটি ঢুকলো প্রথম দোকানে—যে দোকানে ঢুকতে ইচ্ছে করে না, যে নাপিতের শ্রী নেই, সেই দোকানে।

কেন?

একটা ডিম কি আধখানা করা যায়? না, কখনোই নয়। ডিম ভাঙ্গলেই সে একাকার হয়ে গেল। তখন তাকে আর আধখানা করার কোনো উপায় থাকে না। এক চাষীর বৌ কিন্তু বাজারে গিয়ে আধখানা ডিমই বেচে এল।

বাজারে গিয়ে প্রথম খদ্দেরকে সে বেচল যা ডিম ছিল তার অর্ধেক আর আধখানা। দ্বিতীয় খদ্দেরকে সে আবার বেচল বাকি যা রইল তার অর্ধেক সেই সঙ্গে আর আধখানা। ঝুড়িতে তখনও আরও কিছু ডিম আছে। এই ডিমগুলির অর্ধেক আর আধখানা বেচল তৃতীয় খদ্দেরকে। ঝুড়িতে কটা পড়ে রইল? চাষীর বৌ গুনে দেখল, সেখানে রয়েছে আর মাত্র তিনটে ডিম।

কি করে এমনটা হল ? এদিকে চাষীর বৌ দিচ্ছে আধখানা ডিম। কিন্তু ঝুড়িতে শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গা ডিম কোথাও নেই। আধখানা ডিমের হিসেবই বা সে করছে কি করে ?

ভাঙ্গা ডিম হেঁয়ালি মাত্র। চাষীর বৌকে একটা ডিমও ভাঙ্গতে হয়নি। একটু ভালো করে প্রশ্নটার দিকে তাকালেই প্রশ্নের সমাধান মনে ঝিলিক দেবে। কতগুলো ডিম ? এর উত্তর আসবে বিষম সংখ্যায়। যদি ঝুড়িতে ৩১টা ডিম নিয়ে চাষীর বৌ বিক্রি করতে বসে তাহলে তিনজন খদ্দেরকে ভাঙ্গা ডিম বেচেও তার একটা ডিমও ভাঙ্গতে হচ্ছে না।

এটা একটা হেঁয়ালি নয় কি ?

একটা বহু বিখ্যাত হেঁয়ালি সম্পত্তি বিভাজন নিয়ে। একজন ধনী আরব মারা যাবার সময়ে ঘোড়াশালায় সতেরোটি ঘোড়া রেখে গেল। তিন ছেলে ছিল বিত্তশালী আরবটির। ঘোড়াগুলি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে কেমন করে ? সে সম্পর্কে নির্দেশও ছিল তাঁর। বড় ছেলে পাবে অর্ধেক, দ্বিতীয় ছেলে এক-তৃতীয়াংশ আর কনিষ্ঠ একের নয় ভাগ ! ঘোড়াগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী ভাগ করতে গেলে একটারও গর্দান আস্ত রাখা চলে না। অথচ পিতৃবাক্য অমান্যও করেই বা কি করে ? মহা দুর্ভাবনায় তিন ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। মুশকিল আসান করে দিলে বাবার এক পুরোনো বন্ধু। ছেলেদের ডাকে পরের দিন সকালে তিনি ছেলেদের খামারে এসে পৌঁছোলেন। তিন ছেলে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। সব কিছু শুনে তিনি নিজের ঘোড়াটাকে যোগ করলেন ছেলেদের ঘোড়ার সঙ্গে। কটা ঘোড়া হলো এখন ? নিশ্চয়ই ১৮। ১৮-এর অর্ধেক ৯। বড় ছেলে পাবে ৯। ১৮-এর এক-তৃতীয়াংশ ৬। দ্বিতীয়ের ভাগ্যে ৬। আর ১৮-এর এক-নবমাংশ ২ বলে কনিষ্ঠ পাবে ২। সবশুদ্ধ ১৭। না, যে আশঙ্কা হচ্ছিল, বাবার বন্ধু বোধহয় নিজের ঘোড়াটিও দান করে

গেলেন নিখুঁত ভাগের জন্যে, তা ঠিক নয়। যোগফল ১৭ হওয়ায় ছেলেদের দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করে তিনি আবার নিজের ঘোড়াতে চেপেই বাড়ি ফিরতে পারলেন।

এখন ঘোড়া তো ভাগ হয়ে গেল গর্দান দু-টুকরো না করেই। কিন্তু ছেলেরা কি বাপের নির্দেশ ঠিকমতো মান্য করেছিল? সতেরোটা ঘোড়াকে যেভাবে ভাগ করতে বলা হয়েছে, তাতে বোঝা যায়,

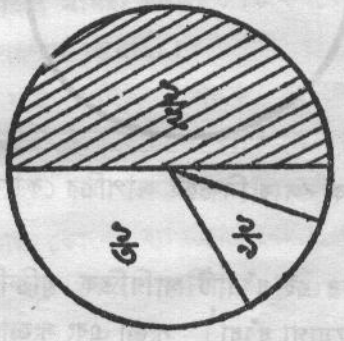

বাবার অঙ্কের বিদ্যে ভাল ছিল না বা এমনও হতে পারে যে তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেরা একটু ভাবনা-চিন্তা করে এর একটা উপায় বের করুক।

উপায় তো বেরোল। ঘোড়াও আস্ত রইল। কিন্তু বাপের নির্দেশ থেকে তাদের একটু সরতে হলো। কি, তাই না?

এই সরে যাওয়ার পরিমাণ কতটা, সহজ গাণিতিক পদ্ধতিতে তা এক মিনিটেই বের করা যায়।

কত রকমের হেঁয়ালি যে আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

দ্বীপ কাকে বলে?

ভূগোলের পাঠে আছে, চারিদিকে জল দিয়ে পরিবেষ্টিত এমন স্থলভাগই দ্বীপ। এখন ধরে নেওয়া যাক, পৃথিবীর উত্তরভাগ সম্পূর্ণই

স্থলভাগ এবং দক্ষিণভাগে স্থলের চিহ্ন নেই। সেখানে পরিপূর্ণ জল। তাহলে উত্তর-ভূখণ্ডকে আমরা কি দ্বীপ বলতে পারি? সেরকমভাবে

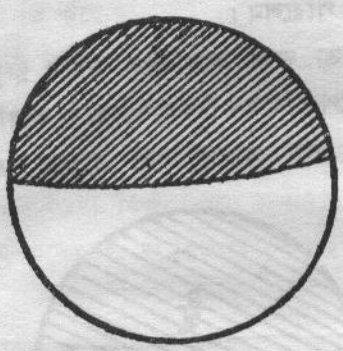

দক্ষিণ ভাগকেও লেক বলায় নিশ্চয়ই আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না।

দ্বীপ এবং লেকের এই ধাঁধাটি গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধাঁধা। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার থেকে যে যুক্তি, গাণিতিক তত্ত্ব তো তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। গণিতবিদ্ প্রথমে যে বস্তু নিয়ে কাজ করছেন, তার একটা সংজ্ঞা দিলেন। হতে পারে, তা বিন্দু, রেখা বা সংখ্যা। কিম্বা এরকমভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি এমন কিছু। এর উপরে গণিতবিদ কয়েকটি সর্ত আরোপ করবেন। এই সর্তগুলিই বস্তুটিকে বেঁধে রাখবে। আর এ থেকেই গড়ে উঠবে গাণিতিক সিদ্ধান্ত একের পর এক।

হতে পারে, যে সর্ত গণিতবিদ্ আরোপ করছেন তা ঠিক নয়, কিন্তু সে সর্তের যাথার্থ বা অসঙ্গতি নিয়ে গণিতবিদ্ চিন্তা-ভাবনা করবেন না। শুধু দেখতে হবে, সর্তগুলি যেন পরস্পর বিরোধী না হয়।

একটি লোক বলছে, 'আমি মিথ্যে কথা বলছি।' এই বক্তব্য কি সত্যি? যদি বক্তব্য সত্যি হয়, তাহলে তো লোকটি মিথ্যে কথা বলছে। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'এই বক্তব্য কি মিথ্যে?' যদি মিথ্যে হয়, তাহলে তো লোকটি সত্যি কথাই বলছে।

এখানে যে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত চলে আসছে, গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময়ে তা এড়িয়ে চলা দরকার।

পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত আসছে এরকম আর একটি হেঁয়ালির কথা বলি। এই হেঁয়ালিটি খুবই প্রচলিত এবং মনকে যথেষ্ট নাড়া দেয়।

প্রত্যেক নিয়মেরই একটা ব্যতিক্রম আছে—এই বিবৃতিটি প্রয়োজনে আর সুযোগ সুবিধে মতো আমরা সবাই প্রবাদ বাক্যের মত প্রয়োগ করি। কিন্তু আমরা একজনও কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, বিবৃতিটি কতটা পরস্পর বিরোধী।

সব নিয়মেরই যদি ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে উপরের নিয়মও তার বাইরে নয়। তখন ওই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু ওই নিয়মটির ব্যতিক্রম মানে কি বোঝায়? নিশ্চয়ই এই বোঝাবে যে, এটি একটি নিয়ম যার কোনো ব্যতিক্রম নেই। তাহলে যদি এমন একটিও নিয়ম থাকে যার কোনো ব্যতিক্রম নেই, তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকছে না।

ধাপে ধাপে বক্তব্যকে আমরা যদি সাজাই, তাহলে লিখবো :

(১) সমস্ত নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে।

(২) উপরের বক্তব্য (১) একটা নিয়ম।

(৩) তাহলে উপরের বক্তব্যেরও ব্যতিক্রম আছে।

(৪) অর্থাৎ সব নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

বিষয়টির জট খুলবার চেষ্টা করেছেন বারট্রান্ড রাসেল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বলেন বিবৃতি, সূত্র বা ওই ধরনের আর যা যা আছে, তারা সব কিন্তু এক পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না। বরং বলা যায়, তারা একেবারেই ভিন্ন। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে—এই বিবৃতিটি কোন্ জাতের?

এই বিবৃতি একটি বস্তু সম্পর্কিত বিবৃতিকে নির্দেশ বা উল্লেখ করে। কিন্তু এই বিবৃতি বস্তু সম্পর্কিত কোনো বিবৃতি নয়। তাহলে এটি কি? ঠিকমতো বলতে গেলে এটি হলো বস্তু সম্পর্কে বিবৃতি বিষয়ে একটি বিবৃতি।

উপরের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তর্ক বিদ্যায় এ রকম আর একটি হেঁয়ালি আছে। তর্ক বিদ্যার জগতে এই হেঁয়ালিটি বোধহয় প্রাচীনতম। খ্রীস্টের জন্মের কয়েক শো বছর পূর্বে ক্রেটের কবি ও দার্শনিক এপিমেনিডেস বর্তমান ছিলেন। তাঁর একটি উক্তি আজও প্রচলিত আছে। উক্তিটি হলো, সমস্ত ক্রেটবাসী মিথ্যেবাদী। এই উক্তিটিকে হেঁয়ালির মত সাজাতে গেলে আর একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে হবে, ক্রেটবাসীদের সমস্ত উক্তিই মিথ্যা।

এই রকম বাড়িয়ে বলা কথা আরও আছে। যখন আমরা বলি, আকাশ জুড়ে যত তারা আছে, সব ফুটেছে। বা এ বছর যে কটা বই ছাপা হয়েছে সব কটাই বাজে। এ রকম আরও হয়, এই নগরের সব কটা দোকানদারই লোক ঠকায়। কিন্তু এই ধরনের বাড়িয়ে বলার সঙ্গে ক্রেটবাসীদের সমস্ত উক্তিই মিথ্যা—এই বিবৃতির অনেক পার্থক্য।

এই বিবৃতি নিজেই নিজের বিরোধিতা করছে কারণ যিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন তিনি নিজেও ক্রেটের অধিবাসী।

ভৌগোলিক ধারণার উপরে একটা সুন্দর হেঁয়ালি আছে। একটা ক্ষ্যাপা মানুষের একবার একটা বিচিত্র বাড়ি করার খেয়াল চাপলো।

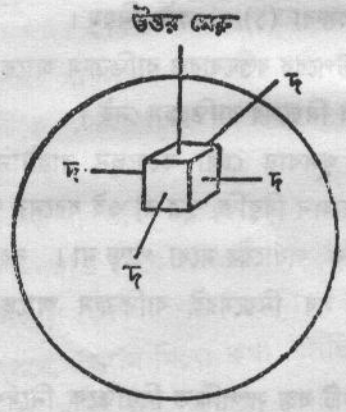

বাড়িটা হবে যাকে বলে একেবারে দক্ষিণ খোলা। দক্ষিণ খোলা বাড়িতেই তো আমাদের আগ্রহ, কি তাই না? ক্ষ্যাপা মানুষটির মনে

হলো, বাড়ির চারদিকের জানালাই থাকবে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। অথচ আপাত দৃষ্টিতে তা সম্ভব নয়। চার মুখো চৌকো বাড়ি হলে দক্ষিণমুখো জানালার উল্টোদিকের দেওয়ালের জানালা উত্তর দিকে মুখ করবেই। আর দু-পাশের জানালা পূর্ব-পশ্চিমমুখো হবেই। এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মাটিতেই এ-রকম বাড়ি তৈরি করা সম্ভব।

কোথায়, কে বলবে ?

উত্তর মেরু হচ্ছে সেই রকম একটি জায়গা যেখানে যে-কোনো বাড়ির সব জানালাই দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে।

ঠিক এই ধারণাটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আর একটা হেঁয়ালি। সাধারণ মানুষের কাছে যেটা একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হতে পারে।

একজন সখের শিকারী কাঁধে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরোল। হঠাৎ সে তার পূর্বে প্রায় একশো মিটার দূরে একটা বিরাটকায় ভালুক

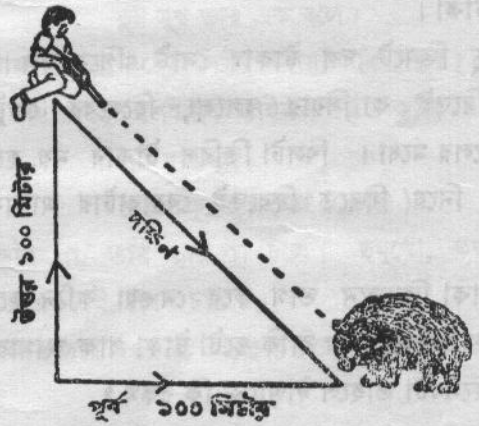

দেখতে পেলো। প্রথমে ভয় পেয়ে শিকারী দৌড়োলো সোজা উত্তর দিকে—হ্যাঁ, তা প্রায় একশো মিটার হবে। কিন্তু তারপরেই সে সম্বিৎ ফিরে পেল, দাঁড়াল, ফিরে তাকাল, দেখলো ভালুক যেখানে ছিল

সেখানেই আছে। শিকারী দক্ষিণ দিকে গুলি চালিয়ে ভালুকটিকে মেরে ফেললো।

এখন বলতে হবে ভালুকটার কি রং ছিল ?

এই হেঁয়ালিটিকে একটু অন্যভাবেও বলা যায়। একজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে গেলো পাঁচ কিলোমিটার, তারপর পশ্চিমে পাঁচ কিলোমিটার, সবশেষে উত্তরে পাঁচ কিলোমিটার এসে সে তার তাঁবু পেয়ে গেলো—ভালুকটার কি রং ছিল ?

মনে হয় নাকি, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। এ লোক ঠকানো প্রশ্ন, এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

গাণিতিক হিসেব নিকেশ নিয়ে একটি হেঁয়ালি আছে। এই হেঁয়ালিটি হেঁয়ালির জগতে খুবই প্রচলিত।

তিন বন্ধু এক বিকেলে রেষ্টুরেণ্টে খেতে গেছে। ট্রে-তে মশলার প্লেট আর বিল নিয়ে বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকলো।

কত হলো ?

তিরিশ টাকা।

তিন বন্ধু তিনটে দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। কাউন্টারে টাকা জমা দিতেই ক্যাসিয়ার বললো, হিসেবের একটু গোলমাল রয়ে গেছে বিলের মধ্যে। বিলটা তিরিশ টাকার নয়, হবে পঁচিশের। পাঁচটা টাকা নিয়ে ফিরতে ফিরতেই বেয়ারাটার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

পাঁচটা টাকা তিনজনে ভাগ করে নেওয়া কঠিন হবে। একটা করে টাকা ফেরত দিই, আর বাকি দুটো টাকা থাক আমারই।

খরচের হিসেবটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি রকম ?

তিন বন্ধুর প্রত্যেকের খরচ হলো ৯ টাকা অর্থাৎ সবশুদ্ধ ২৭। আর দু' টাকা পাচ্ছে বেয়ারা। ২৭ আর ২-এ ২৯। বাকি ১ টাকা কোথায় যাচ্ছে ?

গতি নিয়েও কিছু হেঁয়ালি আছে। ধরে নিই, হাওড়া আর খড়গপুরের মধ্যে ট্রেন যাতায়াত করছে। মেল ট্রেন আছে সেখানে, আছে লোকাল ট্রেনও। মেল ট্রেন চলে ঘণ্টায় ৫০ মাইল আর লোকাল ট্রেন ঘণ্টায় ৩০ মাইল।

যদি একই সময়ে হাওড়া থেকে একটা মেল ট্রেন ছাড়ে আর একটা লোকাল ট্রেন খড়্গপুর থেকে, তাহলে যখন দুটো ট্রেন মুখোমুখি হবে, তখন হাওড়া থেকে কোন্ ট্রেন বেশি দূরে ?

নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এক্সপ্রেস ট্রেন? আসলে কিন্তু তা নয়। যদি ট্রেন দুটোর দৈর্ঘ্য বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যখন তারা মুখোমুখি, তখন হাওড়া থেকে দুটো ট্রেনের দূরত্বই সমান। আর খড়্গপুর থেকে ? হ্যাঁ, খড়্গপুর থেকেও।

পশুপক্ষী, জীবজন্তু, নরনারী নিয়ে অনেক রকমের হেঁয়ালি আছে। লোকসাহিত্য থেকে এ-রকম একটি হেঁয়ালি উল্লেখ করছি :

ছয় পা ভরে ধেয়ে চলে
দুই মুখ তার এক বলে।

এই দুটি লাইন শুনে হেঁয়ালিটির সমাধান কি সম্ভব ?

যদি না হয়, তাহলে শেষ দুটি লাইনও উদ্ধৃত করি,

শুন রাজভৃঙ্গ
চার চক্ষু, এক নেঙ্গ (লেজ)।

অর্থাৎ ছটা পা, তার চার পা চলে। দুমুখো, কথা বলে একটা খ। লেজ একটাই, চোখ চারটে।

ঘোড়া আর তার সওয়ার, এই দুয়ে মিলে হেঁয়ালির সমাধান।

একটা সুন্দর হেঁয়ালি আছে চাকরি নিয়ে। একটা বড় কোম্পানি শহরে একটা নতুন শাখা খোলার কথা চিন্তা করছে। দরখাস্তকারীর সংখ্যা অনেক কিন্তু বেছে ডাকা হল মাত্র তিনজনকে।

ম্যানেজার বললেন, এখন শিক্ষানবীশী অবস্থা—ছ-মাস অন্তর পাবে মাত্র ২০০ টাকা। কিন্তু কাজ যদি ভালো হয়, তাহলে দ্রুত মাইনে বেড়ে যাবে। মাইনে দু-ভাবে বাড়তে পারে। হয় ছ-মাস অন্তর ১০ টাকা, না হলে বছরে ৩০ টাকা।

কোন্ স্কেলটা বেশি লোভনীয়?

নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে দ্বিতীয় স্কেলটা?

হেঁয়ালির বৈশিষ্ট্যই ওই। আপাত নিরীহ প্রশ্নের সহজ উত্তর। সকলের কাছেই তাই। দ্বিতীয় স্কেলটাতেই মন টানবে। কিন্তু সেই স্কেলের চেয়ে প্রথম স্কেল যে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

ম্যানেজার শুধু তিনজনকে ডেকেছিলেন। তাদের উত্তর কি হবে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তিনজনের বদলে যদি বেশি জনেও আসতো, তাহলেও অধিকাংশের নজর যেতো ওই দ্বিতীয় স্কেলটার দিকে। প্রথম স্কেলে প্রথম বছর থেকেই টাকা বেশি অথচ হেঁয়ালি এমন জিনিষ যে সকলের নজরই কেড়ে নেবে দ্বিতীয় স্কেলে।

হেঁয়ালির শেষ নেই। কত রকমের হেঁয়ালি যে আছে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কবে কোন্ যুগ থেকে তার শুরু, এ হিসেব করবে কে? গাণিতিক হেঁয়ালি তো আছেই, তার সঙ্গে আছে ভৌগোলিক হেঁয়ালি, সময় সংক্রান্ত হেঁয়ালি, লৌকিক হেঁয়ালি, সম্পর্ক নিয়ে হেঁয়ালি, তর্কবিদ্যার হেঁয়ালি। হেঁয়ালির যাতায়াত সর্বত্রই। সব মহলেই তার প্রবেশ অধিকার আছে। কিন্তু বিষয়গত একেবারে জটিল হেঁয়ালিগুলি ছাড়া আর সব হেঁয়ালিগুলি বুঝবার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বুদ্ধির আর যুক্তির।

মূল কত

যাঁরা সংখ্যার খেলা দেখান তাঁদের দিকে আমরা অনেক সময়ে অবাক হয়ে তাকাই। বড় বড় সংখ্যা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হচ্ছে চক দিয়ে, গুণ দিলে গুণফল বলে দিচ্ছেন সংখ্যাবিদে, ভাগ দিলে ভাগফল। এ তো ম্যাজিকের মত, কিম্বা ম্যাজিকের চেয়েও বাহাদুরি আছে এখানে। যা হচ্ছে চোখের সামনে, আলো আঁধারের, আড়াল আবডালের কোনো বালাই নেই। সবাই ঘিরে আছে চারদিক থেকে। সংখ্যা নিয়ে এ ধরনের খেলা দেখার সময়ে মুখে আর কারো রা কাড়ে না।

তখন মনে হয় না, সংখ্যা নিয়ে এ ধরনের খেলা যদি আর পাঁচজনকে দেখাতে পারতাম! এ তো ২ আর ৩-এ ৫ বা ৫ গুণিত ২-এ ১০ নয়, ৪-এর বর্গ ১৬ বা ৩-এর ঘন ২৭-ও নয় যে, এক নিঃশ্বাসে বিনা আয়াসেই বলে দেবো। এখানে আছে মস্ত বড় সংখ্যা, অনেক অঙ্কের মধ্য দিয়ে যা একটা চেহারা নিয়েছে। এ-রকম সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করায় আনন্দ আছে বৈকি।

গুণফল বা ভাগফলের কথা থাক, গুণ-ভাগের চেয়ে বর্গমূল বা ঘনমূল বের করা কঠিন। এর মধ্যে ঘনমূল বের করা নিশ্চয় আরও শক্ত। স্কুলে ঘনমূল বের করার কোনো নিয়ম শেখানো হয় না। বর্গমূল বের করার নিয়ম অবশ্য একটা আছে। তাতে বর্গমূলের অঙ্ক করা যায় কিন্তু কাগজ কলম ছাড়া সে অঙ্কের সমাধান বের করা অসম্ভব।

এই অসম্ভবকে যদি সম্ভব করা যায়, না, বেশি সময় নিয়ে নয়, বরং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আর কাগজে-কলমে একটি আঁচড়ও

না কেটে, তাহলে? সবাইকে কি একেবারে অবাক করে দেওয়া যাবে না?

বর্গমূলের পরে আছে ঘনমূল। সেই ঘনমূলও বলা যায় খুব দ্রুত আর মুখে মুখে। দু-অঙ্কের একটা সংখ্যার ঘনফল। চারটে, পাঁচটা বা ছটা অঙ্ক। বোর্ডের উপরে লেখা হয়েছে। অঙ্কের সব সংখ্যা যেন মাথার মধ্যে, এমনভাবে নিরুদ্বেগে কেউ তার ঘনমূলের উত্তর দিয়ে দিল। কেমন লাগে তখন?

যদি ব্যাপারটাতে রোমাঞ্চ হয়, ভাল লাগে, অবাক করে দেওয়ার ইচ্ছে আসে তাহলে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? না, এ অঙ্ক-ভীরু ছাত্রের একশোয় একশো পাওয়ার মত চেষ্টা করা নয়। সে তো অসম্ভব ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারটাই এখানে সাজানো রয়েছে উৎসাহী পাঠকের কাছে। শুধু ধীরে-সুস্থে ধাপগুলি বুঝে নেওয়া।

সবাইকে তাক লাগাবো। সাজ-সরঞ্জাম কিছু নেবো না। তাহলে গাণিতিক বুদ্ধিতে একটু শান না দিলে চলবে কেন?

এসো, আগে বর্গমূল বের করা যাক।

৪-এর বর্গমূল বের করা কোনো কঠিন কাজ নয়। ৯, ১৬, ২৫, ৩৬, ৪৯, ৬৪, ৮১, ১০০ অনায়াসেই আমরা এ-সব সংখ্যার বর্গমূল বের করতে পারি। কিন্তু এর চেয়ে বড় সংখ্যা যদি নিই!

উপরে যে-সব সংখ্যা নিয়েছি, তার প্রত্যেকটাই পূর্ণ বর্গসংখ্যা অর্থাৎ মূল বের করবার সময়ে ভাগশেষ কিছুই থাকবে না।

এই ধরনের পূর্ণ বর্গসংখ্যারই আমরা বর্গমূল বের করবো।

যদি এ-রকম একটা পূর্ণ বর্গসংখ্যা নেওয়া যায়, যেটা চার অঙ্কের, তা'হলে কি করে আমরা বর্গমূল বের করবো?

এ ধরনের সংখ্যার বর্গমূলে আসবে দুটো অঙ্ক।

বর্গমূল বের করার ম্যাজিক কাউকে দেখানোর আগে, পর পৃষ্ঠার তালিকাটি প্রথমে ভাল করে মুখস্থ করে নাও।

সংখ্যা	বর্গ
১	১
২	৪
৩	৯
৪	১৬
৫	২৫
৬	৩৬
৭	৪৯
৮	৬৪
৯	৮১

তালিকাটির দিকে ভালো করে তাকাও। কিছু কি বৈশিষ্ট্য নজরে আসছে? নিশ্চয়ই আসার কথা। ধরো, একটা সংখ্যার বর্গ দেওয়া আছে, শেষ অঙ্ক ৬। এই ৬ দেখে কি তুমি মূলের শেষ অঙ্কটা বুঝতে পারবে? মূলের শেষ অঙ্ক ৪-ও হতে পারে আবার ৬-ও। কারণ ৪-এর বর্গ ১৬ আবার ৬-এর বর্গও ৩৬। দুটো বর্গেরই শেষে আছে ৬। যদি বর্গের শেষ অঙ্কে ৯ থাকে, তাহলে? তখন বর্গমূলে ৩-ও থাকতে পারে, আবার ৭-ও। ব্যতিক্রম শুধু ৫। বর্গের শেষ অঙ্কে ৫ থাকলে, বর্গমূলের শেষ অঙ্কেও ৫ থাকবেই। অন্য কিছুই নয়।

এখন ধরো তুমি চার অঙ্কের একটা সংখ্যার বর্গমূল বের করবে। বর্গমূল হবে দুই অঙ্কের।

৩১৩৬ সংখ্যাটি নিই।

দুইভাগে ভাগ করি সংখ্যাটাকে। একদিকে নিই ৩১, আর একদিকে ৩৬।

৩১ ৩৬

ডানদিকের ভাগে এককের অঙ্কে আছে ৬। তাহলে বর্গমূলের এককের অঙ্কে দুটি সংখ্যা বসার সম্ভাবনা। হয় ৪ বা ৬।

এবার বাঁ-দিকের ভাগের ৩১ সংখ্যাটাকে দেখি। ৩১-এর চেয়ে ঠিক ছোট কোন্ বর্গসংখ্যা আছে? তা তো অবশ্যই ২৫। ২৫-এর বর্গমূল ৫। ৫ হলো দুই অঙ্কের বর্গমূলের দশকের অঙ্ক। তাহলে বর্গমূল হবে হয় ৫৪ না হয় ৫৬।

৪ হবে না ৬ হবে সেটা ঠিক করবো কি করে?

এবারে যে নিয়মটা বলবো সেটা ঠিক করে মনে রাখতে হবে।

দশকের অঙ্কের সংখ্যা নাও। এই সংখ্যাটির সঙ্গে ১ যোগ করে সংখ্যাটি দিয়েই গুণ করো।

তাহলে ৫ (৫+১)=৩০।

বর্গের দুই ভাগের বাঁ-দিকের থেকে এটি ছোট। তবে এককে বড় সংখ্যাটা নিতে হবে।

মূল হবে ৫৬।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

৫৩২৯-এর বর্গমূল কত?

দুইভাগে সংখ্যাটি ভাগ কর।

৫৩ ২৯

এককের অঙ্কে ৯। বর্গমূলে হতে পারে তাহলে ৩ বা ৭। বর্গমূলের দশকের অঙ্কে বসবে ৭। কারণ ৫৩-এর চেয়ে ছোট বর্গ-সংখ্যা ৪৯।

এখন সংখ্যাটি হয় ৭৩ হবে না হলে ৭৭।

আবার আগের মত

৭ (৭+১)=৫৬

৫৬, ৫৩ এর চেয়ে বড়। তাহলে নিতে হবে ছোট সংখ্যাটি।

বর্গমূল হবে ৭৩।

আর একটু এগিয়ে এবারে চার অঙ্কের চেয়ে বড় সংখ্যা নেওয়া

যাক। হয় পাঁচ অঙ্কের বা ছয় অঙ্কের। এদের বর্গমূল হবে তিন অঙ্কের।

প্রথমে এমন সংখ্যাই নিই যারা ৪০০০০-এর চেয়ে ছোট।

আগে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার বর্গের যে তালিকা দিয়েছি, তার সঙ্গে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার বর্গের তালিকাটিও বলছি। এটিও কিন্তু একেবারে কণ্ঠস্থ রাখতে হবে।

সংখ্যা	বর্গ
১০	১০০
১১	১২১
১২	১৪৪
১৩	১৬৯
১৪	১৯৬
১৫	২২৫
১৬	২৫৬
১৭	২৮৯
১৮	৩২৪
১৯	৩৬১
২০	৪০০

এবারে ২৪,৬৪৯-এর বর্গমূল বের করতে হবে।

আগের মত এখানেও সংখ্যাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করবো। ডান-দিকের ভাগে একক এবং দশকের দুটি মাত্র অঙ্ক অর্থাৎ নেবো ৪৯, বাঁ-দিকের ভাগে ২৪৬।

২৪৬ ৪৯

এককের অঙ্ক ৯। তাহলে বর্গমূলে এককের অঙ্কে আসবে হয় ৭ না হলে ৩।

আর সম্পূর্ণ বর্গমূল বের করার জন্যে ডানদিকের ভাগে তাকাই।

ডানদিকের ভাগে আছে ২৪৬। ২৪৬-এর চেয়ে ঠিক ছোট বর্গসংখ্যা ২২৫। ২২৫-এর বর্গমূল ১৫।

এখন সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে হয় ১৫৩ বা ১৫৭।

কিন্তু এককে ৩ নেবো না ৭ নেবো? চার অঙ্কের বর্গসংখ্যার বেলায় যে-ভাবে ঠিক করেছি এখানেও ঠিক সেইভাবেই ঠিক করবো।

তাহলে ১৫ (১৫ + ১) = ১৫ × ১৬ = ২৪০।

২৪০, ২৪৬-এর চেয়ে ছোট। ফলে আসবে তাহলে এককের বড় সংখ্যা অর্থাৎ বর্গমূল ১৫৭।

আগের নিয়ম খাটিয়ে সংক্ষেপে ২৬৫৬৯-এর বর্গমূল বের করো তো?

মূলে এককের অঙ্ক ৩ বা ৭।

২৬৫-এর চেয়ে ঠিক ছোট বর্গসংখ্যাটি ২৫৬। মূল ১৬। তাহলে সংখ্যাটি ১৬৩ বা ১৬৭।

এখন ১৬ (১৬ + ১) = ১৬ × ১৭ = ২৭২। এটি ২৬৫-এর চেয়ে বড়। তাহলে বর্গমূল ১৬৩।

কিন্তু যদি ৪০০০০-এর চেয়ে বড় সংখ্যা নিই, তাহলে?

তখন সংখ্যাটাকে ডানদিক থেকে দুটো করে অঙ্কের এক একটা ভাগে ভাগ করবো।

যদি সংখ্যাটা হয় ১৯১৮৪৪। তাহলে তিনটে ভাগ হবে

১৯ ১৮ ৪৪

ডানদিক থেকে প্রথম ভাগ ৪৪, দ্বিতীয় ভাগ ১৮ আর তৃতীয় ভাগ ১৯।

তৃতীয় ভাগে ১৯-এর ঠিক নীচের বর্গসংখ্যা কোন্‌টি? এটি ১৬। আর ১৬-এর বর্গমূল ৪। অর্থাৎ বর্গমূলের শতকের অঙ্ক ৪।

এখন ১৯ − ১৬ = ৩

এই সংখ্যাটাকে এবারে দ্বিতীয় ভাগের ১৮-এর সামনে বসাই। হলো ৩১৮। না, ৩১৮ নেওয়ার দরকার নেই। শুধু নিই ৩১। ৩১-কে ধরবো ভাজ্য হিসেবে। ভাজক কি হবে? বর্গমূলের শতকের

অঙ্ক ৪। ৪-কে ২ দিয়ে গুণ করে ১ যোগ করি। পেলাম ৯। ৯-ই ভাজক। ৩১-কে ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল আসে ৩। এখানে বলে রাখা ভাল, আমাদের দরকার এমন ভাগফল যেখানে ভাগশেষ হবে সবচেয়ে কম। কি, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে লাগছে না? হ্যাঁ, সবচেয়ে কম ভাগশেষের জন্যে ভাগফল আমাদের নিতে হতে পারে উপরের বা নীচের দিক থেকে। অর্থাৎ ভাগফল আমরা ৩-এর বদলে ৪-ও নিতে পারতাম যদি ভাগশেষ সেখানে আরও কম হতো। কিন্তু ৩ ভাগফল হলে ভাগশেষ ৪ আর ৪ ভাগফলে ভাগশেষ ৫। তাহলে ভাগফল আমাদের নিতে হবে নীচের দিক থেকে, অর্থাৎ ৩-ই।

৩ হচ্ছে বর্গমূলের দশকের অঙ্ক।

এবার বের করবো এককের অঙ্ক।

প্রথম ভাগে আছে ৪৪। তাহলে বর্গমূলের এককের অঙ্ক হয় ২ বা ৮।

এখন ২ আর ৮-এর মধ্যে কোন্‌টা নেবো? নিয়মটা অনেকটা আগের মতনই। ভাগফল দেখবো কোন্ দিক থেকে নিচ্ছি। যদি নীচের দিক থেকে নিই, তাহলে নেবো উপরের সংখ্যা, না হলে নীচের। এখানে বর্গমূলের দশকের অঙ্কের ৩ নীচের দিকের ভাগফল বলে ২ আর ৮-এর মধ্যে বড় সংখ্যা ৮-ই নেবো বর্গমূলের এককের অঙ্ক।

তাহলে বর্গমূল হবে ৪৩৮।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

যে সংখ্যার বর্গমূল বের করতে হবে, সেটি ধরি ৫৮৫৬৪।

ডানদিক থেকে দুটি করে সংখ্যা নিয়ে এক একটি ভাগে ভেঙ্গে ফেলি।

৫ ৮৫ ৬৪

বর্গমূলে শতকের অঙ্ক নিশ্চয়ই ২। ২ এর বর্গ ৪।

আবার ৫—৪=১।

সেই ১-কে নিয়ে আসি মাঝের ভাগে। হলো ১৮৫। নিই কেবল ১৮। ভাজ্য ১৮।

সেই সঙ্গে ভাজক ২×২+১=৫।

এখন সবচেয়ে কম ভাগশেষের জন্যে ভাগফল ধরতে হবে। তাহলে ভাগফল ৪। অর্থাৎ বর্গমূলের দশকের অঙ্ক ৪।

এককের অঙ্ক হয় ২ না হয় ৮।

এখন ভাগফল নিচ্ছি উপরের দিক থেকে। অর্থাৎ ভাজ্য যেখানে ১৮, ৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল সেখানে ৩ হওয়া উচিত। আমরা নিচ্ছি ৪। সেইজন্যে বর্গমূলের এককের অঙ্ক নেবো ছোট সংখ্যাটি অর্থাৎ ২।

তাহলে সম্পূর্ণ বর্গমূল ২৪২।

এখানে একটা কথা সকলেরই মনে হবে। বর্গমূল যখন তিন অঙ্কের সংখ্যা, তখন মূলের দশকের বা এককের অঙ্কের সংখ্যা বের করবার সময়ে ভাগশেষের একটা দরকারি ভূমিকা আছে।

কিন্তু ভাগশেষে যদি কিছু না থাকে অর্থাৎ ভাগশেষ যদি শূন্য হয়, তখন কি হবে? সে সময়ে বর্গমূলের এককের ঘরে ছোট সংখ্যাটাই নিতে হবে।

এইভাবে বর্গমূল বের করার সময়ে কোথাও কোথাও একটু অসুবিধেও হয়। সে অসুবিধে দেখতে পাবে, শেষে যখন ৬ থাকে। তখন আগের নিয়ম খাটবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। খাটতেও পারে আবার নাও পারে।

একটা সংখ্যা ১৩৩৯৫৬।

তিন ভাগে সংখ্যাটিকে লিখি

১৩ ৩৯ ৫৬

শতকে বর্গমূলের অঙ্ক ৩। ১৩—৯=৪, তাহলে ভাজ্য নিচ্ছি

৪৩। ভাজক ৩×২+১=৭। ভাগশেষ সবচেয়ে কম পাবো যখন ভাগফল ৬। ভাগশেষ আসছে ১। বর্গমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক ৬।

এককের অঙ্কে হবে হয় ৪ না হয় ৬। ভাগফল নিচ্ছি ৪৩-এর চেয়ে কম। এককের সংখ্যা তাই ৪ আর ৬-এর মধ্যে ৬।

অতএব বর্গমূল ৩৬। এখানে মিললো।

এবারে আর একটা সংখ্যা নিই। ছয় অঙ্কের এই সংখ্যাটি ৯৭২১৯৬। এটির শেষে আছে ৬। তিন ভাগে সংখ্যাটিকে লিখি

৯৭ ২১ ৯৬

নিয়ম অনুসারে বর্গমূল হওয়ার কথা ৯৯৪। কিন্তু আসল বর্গমূল ৯৮৬। চেষ্টা করলে সঠিক উত্তরও মাথা ঠাণ্ডা করে বের করা যায়। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে সে চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে।

*

স্কুলে বর্গমূল বের করার যে নিয়ম শেখানো হয় তার সঙ্গে স্রেফ ম্যাজিক দেখানোর মত মুখে মুখে বর্গমূল বলার কৌশলের নিশ্চয় অনেক পার্থক্য। কাগজ কলম ছাড়া দু অঙ্ক বা তিন অঙ্কের বর্গমূল নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া, এ কথা কেউ কি ভাবতে পারে? শেষে ৬ থাকলে একটু অসুবিধে হয় কোথাও কোথাও, কিন্তু তা ছাড়া?

মুখে মুখে বর্গমূল বলে দেওয়ায় যতটা বাহাদুরি, ঘনমূলের বেলায় সে বাহাদুরি নিশ্চয়ই অনেক বেশি। ৩-কে তিনবার গুণ করলে ২৭, তাহলে ২৭-এর ঘনমূল ৩, ৪-কে তিনবার গুণের ফল ৬৪, তাহলে ৪ হবে ৬৪-এর ঘনমূল।

যে কোন সংখ্যার বর্গফল যতটা, ঘনফল তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে আরও বড় সংখ্যা এবং আরও বাহাদুরি সেখানে।

এবারে এই বাহাদুরির টানে একটা পূর্ণ ঘনসংখ্যার ঘনমূল বের করবার চেষ্টা করি। মূল যেখানে দু অঙ্কের সেখানে উত্তর দেওয়া

কোনো সমস্যাই নয়। এ-রকম অবস্থায় ঘনমূল আমরা খুব তাড়াতাড়িই বলতে পারবো।

ঘনমূল বের করার আগে নীচের তালিকাটি একেবারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে।

সংখ্যা	ঘন
১	১
২	৮
৩	২৭
৪	৬৪
৫	১২৫
৬	২১৬
৭	৩৪৩
৮	৫১২
৯	৭২৯

তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, বর্গফলের সঙ্গে ঘনফলের তফাৎ অনেক। ঘনফলের এককের অঙ্কে ১, ৪, ৫, ৬ আর ৯ থাকলে ঘনমূলের এককের অঙ্ক অভিন্ন হবে। তাহলে ঘনফলের এককের অঙ্ক ১ হলে ঘনমূলের এককের অঙ্কও হবে ১, ৪ হলে ৪-ই, ৫, ৬ বা ৯ হলে যথাক্রমে ৫, ৬ বা ৯-ই। ঘনফলে অন্য কোনো অঙ্ক থাকলেও অবশ্য মূলের এককের অঙ্ক নির্ণয়ে এতটুকু অসুবিধে নেই। ঘনফলে ৮ থাকলে মূলে ২, ৭ থাকলে মূলে ৩, ৩ থাকলে ৭, ২ থাকলে ৮।

এতে কি দেখছি আমরা? ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নটা সংখ্যার ঘনফলেরই এককের অঙ্ক আলাদা। তাহলে ঘনফলের এককের অঙ্ক দেখলেই ঘনমূলের এককের অঙ্ক বসিয়ে দেবো। ১, ৪, ৫, ৬, ৯ দেখলে ঘনমূলে বসাবো যথাক্রমে ১, ৪, ৫, ৬, ৯-ই। ৮, ৭, ৩, ২, দেখলে বসাবো যথাক্রমে ২, ৩, ৭, ৮।

এবারে দশকের অঙ্কের মূল বের করবো। আগে যে তালিকাটি নিয়েছি, সেই তালিকাটিকেই কাজে লাগাবো, তবে একটু অন্যভাবে।

একটা ঘন সংখ্যা নাও, এমন সংখ্যা যার মূল দুই অঙ্কের। ঘন সংখ্যার একক থেকে শতক পর্যন্ত সংখ্যা বাদ দিয়ে সহস্র থেকে উপরের দিকে তাকাবো। তালিকার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে, এই সংখ্যাটি আছে ঠিক দুটো ঘন সংখ্যার মাঝখানে। এর ছোটটা নিই আর তার ঘনমূল নিয়ে বসাই দশকের ঘরে।

সম্পূর্ণ সংখ্যাটাই পেয়ে যাচ্ছি তাহলে।

এবার একটা সংখ্যা নেওয়া যাক।

যদি সংখ্যাটা হয় ৬৫৮,৫০৩, তাহলে এর ঘনমূল কত হবে?

সংখ্যাটা শেষ হচ্ছে ৩-এ, তাহলে দুই অঙ্কের সংখ্যার এককের মূল নিশ্চয়ই ৭। ঘনমূলের দশকের ঘরে কত বসবে? ৬৫৮ নিয়ে দেখি, এটা আছে ৫১২ আর ৭২৯ সংখ্যার মধ্যে। দুটো সংখ্যার মধ্যে ছোটটা ৫১২। তার মূল ৮। তাহলে ৬৫৮,৫০৩-এর ঘনমূল ৮৭।

এইভাবে, মূল দুই অঙ্কের হলে, যে কোনো ঘন সংখ্যার ঘনমূল আমরা সহজেই বের করতে পারি।

তাহলে

১০৩৮২৩-এর ঘনমূল ৪৭

৮৮৪৭৩৬-এর ঘনমূল ৯৬।

এবারে মূল তিন অঙ্কের আসে, এমন সব ঘন সংখ্যা নেবো। দেখা যাক, এ ধরনের সংখ্যার কিভাবে মূল বের করে।

মূল যার তিন অঙ্কে এ রকম যে কোনো সংখ্যার ঘনফলে থাকবে হয় ৭ বা ৮ না হলে ৯টি অঙ্ক—এটুকু মনে রাখতে হবে। তাহলে ৭, ৮ বা ৯ অঙ্কের ফল দেখলেই বুঝতে পারবো, মূলে থাকবে তিনটি অঙ্ক।

আগে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার ঘনফলের একটা তালিকা দিয়েছি। আর একটা তালিকা যোগ করবো ওই তালিকার সঙ্গে!

ক	খ
১	১
২	৭
৩	৯
৪	৫
৫	৩
৬	৮
৭	৬
৮	২
৯	৪
১০	১০

এবারে এই দুটো তালিকা স্মৃতিতে নিয়ে মূল তিন অঙ্কে আসে এ-রকম যে কোনো সংখ্যার ঘনমূল বের করবার চেষ্টা করা যাক।

আগে বলেছি, মূল তিন অঙ্কের হলে আসল সংখ্যাটা হবে ৭, ৮ বা ৯ অঙ্কের। এককের দিক থেকে শুরু করে সংখ্যাটাকে তিন ভাগে ভাগ করি। প্রথম ভাগে তিনটে অঙ্ক, দ্বিতীয় ভাগেও তিনটে আর তৃতীয় ভাগে এক, দুই বা তিন।

প্রথম ভাগের মূল বের করবো প্রথম তালিকা থেকে। মূল যখন দুটি অঙ্ক, তখন যেভাবে করেছি ঠিক সেইভাবে। শতকের ঘরের মূল বের করাও কঠিন নয়। মূল দুই অঙ্কের বেলায় দশকের ঘরের মূল কিভাবে বের করেছি, মনে আছে? সেই প্রথম তালিকার সাহায্য নেবো। কোন্ দুটো ঘনফলের মধ্যে তৃতীয় ভাগের সংখ্যাটি পড়ে, দেখতে হবে। আর যে সংখ্যাটি ছোট তার মূল নেবো শতকের ঘরের মূল হিসেবে।

বাকি রইলো শুধু দশকের ঘরের মূল বের করা। এবারে সেই মূল বের করবো। সম্পূর্ণ সংখ্যাটির দিকে একবার তাকাও। যুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলি যোগ করে নাও। অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলিও।

মনে রেখো ডানদিকের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ এককের স্থানের অঙ্ক প্রথম অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা আর দশকের অঙ্ক প্রথম যুগ্ম স্থানের সংখ্যা। এখন অযুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল থেকে যুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল বাদ দাও। কিন্তু, যদি যুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল অযুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল থেকে বেশি হয়, তাহলে? তখন অযুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফলের সঙ্গে আরও ১১ যোগ করতে হবে। এই বিয়োগফলের সংখ্যাটি মনে রাখো।

এখন এই বিয়োগফলকে দ্বিতীয় তালিকার ক স্তম্ভে খুঁজে নাও। খ স্তম্ভে এর জোড়া সংখ্যা কোন্‌টি? বিয়োগফল ৯ হলে খ স্তম্ভে ৪, ৪ হলে ৫, ৭ হলে ৬। খ স্তম্ভের ঠিক সংখ্যাটি পেয়ে গেলে ঘনমূলের দশকের অঙ্ক বের করা যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একক এবং শতকের ঘরের মূল যোগ করে খ স্তম্ভের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বাদ দাও। এই সংখ্যাটিই দশকের ঘরের মূল। তাহলে এইভাবে পুরো সংখ্যাটাই বেরিয়ে আসছে।

এবারে একটা উদাহরণ দিই।

১৪,৮৮৬,৯৩৬-এর ঘনমূল বের করো।

প্রথম তালিকা থেকে মূলের এককের এবং শতকের অঙ্ক সহজেই বেরিয়ে আসে। এককের মূল নিশ্চয় ৬। শতকের মূল ২।

এখন শুধু দশকের মূলটি বের করা।

তাহলে আগে অযুগ্ম স্থানগুলির সংখ্যার যোগফল বের করি।

$$৬+৯+৮+৪=২৭$$

আর যুগ্ম স্থানগুলির সংখ্যার যোগফল হলো

$$৩+৬+৮+১=১৮$$

যে নিয়ম বলা হয়েছে, তাতে দেখি ২৭ − ১৮ = ৯।

মনে আছে নিশ্চয়, এখন দ্বিতীয় তালিকাটি দেখতে হবে। দ্বিতীয় তালিকার ক স্তম্ভে ৯ যেখানে আছে, তার উল্টোদিকে খ স্তম্ভে আছে ৪।

এবার মূলের একক আর শতকের অঙ্ক যোগ করতে হবে। যোগফল ৬ + ২ = ৮। এই যোগফল থেকে ৪ বাদ দিলে পাই ৮ — ৪ = ৪-ই। ৪ হলো মূলের দশকের অঙ্ক।

ঘনমূল পাচ্ছি ২৪৬।

আর একটা সংখ্যা নেওয়া যাক ৪৮,৬২৭,১২৫। এর ঘনমূল বের করতে হবে। কি করে করবো? তিন ভাগে সংখ্যাটাকে লিখি

৪৮ ৬২৭ ১২৫।

ঘনমূলের একককে ৫, শতকে ৩। এটুকু বুঝতে নিশ্চয় কারো কোনো অসুবিধে নেই। শুধু দশকের অঙ্কটা বের করতে গেলেই একটু হিসেব-নিকেশ করতে হয়।

অযুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল = ১৬

যুগ্ম স্থানের সংখ্যার যোগফল = ১৯

অযুগ্ম দেখছি যুগ্মের থেকে কম। তাহলে অযুগ্মের সঙ্গে ১১ যোগ করি। ১৬ + ১১ = ২৭ আর ২৭ — ১৯ = ৮। সবই নিয়ম ধরে করছি। ৮ হচ্ছে দ্বিতীয় তালিকার ক স্তম্ভের সংখ্যা। ৮-এর বিপরীতে খ স্তম্ভে আছে ২। এখন ঘনমূলের একক আর শতকের অঙ্ক যোগ করে তা থেকে ২ বাদ দিচ্ছি। তাহলে ৫ + ৩ — ২ = ৬।

ঘনমূল বেরোল ৩৬৫।

এখানেই থামবো, না আরও এগোবো? থামি এখানেই, কিন্তু দুটো কথা বলে নিই। বর্গমূল, ঘনমূল মূলের শেষ কথা নয়। আরও এগোনো যায়। এবং অনেকদূর পর্যন্ত। আস্তে আস্তে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে?, কি, তাই না? বাড়ারই কথা।

কিন্তু শেষ সীমা পর্যন্ত কে এগিয়ে দেবে? আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তাতে এগিয়ে যাওয়া যায় অনেকটা। বাকিটুকুর জন্যে নিজের উৎসাহের উপরে ভরসা রাখো।

যাব উত্তরে, কেন আসে দক্ষিণের গাড়ি ?

দুই বিজ্ঞানী বন্ধু একই বহুতল বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন তলায় কাজ করতেন। একজনের অফিস তিনতলায় আর একজনের সাততলায়। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে একজনকে আর একজনের কাছে প্রায়ই যেতে হত। সাততলার অফিসটি ছিল অনেক বেশি আরামদায়ক! ফলে পরস্পরের দরকার হলেই তিনতলার বন্ধুই অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটের সুইচ টিপতেন।

কিন্তু সুইচ টিপবার সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত খটকা লাগত। প্রথম যে লিফ্‌টটা এসে দাঁড়াত তার সামনে, তিনি দেখতেন, সাধারণভাবে সেটা চলেছে উল্টোমুখে। তিনি লিফ্‌টে উপরে উঠবেন। কিন্তু প্রথম লিফ্‌ট, সামনে যেটা আসতো, দেখতে পেতেন, সেটা চলেছে নীচের দিকে। অদ্ভুত ব্যাপার। ৬ বার লিফ্‌টে উঠবার জন্যে বেল টিপলে তিনি দেখেন ৫ বারই এ রকম হচ্ছে!

বন্ধুকে এসে অভিযোগের সুরে তিনি ঠাট্টা করতেন! এটা কী রকম চলেছে! তোমাদের সুবিধের জন্যে সব লিফ্‌টই চলেছে উপর থেকে নীচে। নীচ থেকে উপরে আসবার লিফ্‌ট পাওয়াই যায় না।

হাল্‌কা হাসিতে বন্ধুটি নিশ্চয় বললেন, তাতো হতে পারে না। লিফ্‌ট সমানে যাচ্ছে আসছে। একটা হিসেব-নিকেশ নিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আমার সাততলার অফিস থেকে যখন তুমি নামছো, তখন দেখোতো লিফ্‌টের সুইচ টেপার পরে কোন্ দিকের লিফ্‌ট আগে আসছে? উপর থেকে নীচের লিফ্‌ট না নীচ থেকে উপরের লিফ্‌ট?

ঠিকই! ব্যাপারটা তিনতলার বন্ধুর আগেই মাথায় আসা উচিত

ছিল। তিনতলা থেকে বাড়ির প্রায় মাথায় সাততলায় যখন উঠতে হচ্ছে তখন সাততলা থেকে নামতেও হচ্ছে তাঁকে। ফলে আগের মতনই তিনি একটু খেয়াল করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য! তিনতলা থেকে উঠবার সময়েও যে রকম, সাততলা থেকে নামবার সময়েও সে-রকম। ছ'বারের মধ্যে পাঁচবার 'লিফ্‌ট', দেখেন, চলেছে নীচ থেকে উপরে আর একবার মাত্র উপর থেকে নীচে।

তাহলে? দুজনেই অবাক হলেন। এ-রকম হওয়ার কারণ কী?

বিজ্ঞানের জগতে এই দু'জন বিশিষ্ট মানুষের একজন জর্জ গ্যামো, অন্যজন মারভিন স্টার্ন। জর্জ গ্যামোর অফিস তিনতলায়, একই বিল্ডিংয়ে। স্টার্ন থাকতেন আরও চারতলা ওপরে। ঘটনাস্থল ক্যালিফোরনিয়া, সময় ১৯৫৬-এর গ্রীষ্মকাল, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের কথা।

আলোচনা যখন দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে এবং ব্যাপারটা যখন ঘটছে তখন এ-রকম হেঁয়ালির সমাধান বের না করে ছেড়ে দেওয়া যায় না শুধু আকস্মিকতার দোহাই দিয়ে। নীচ থেকে উপরে উঠবার সময়ে ঘটছে এবং উপর থেকে নীচে নামবার সময়েও। ব্যতিক্রম নেই কোথাও।

লিফ্‌টে ওঠা-নামার সময়ে এই অদ্ভুত ঘটনা শুধু দুই বৈজ্ঞানিকের জীবনের ঘটনা নয়, আমরাও এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে লিফ্‌টে তো আমাদের রোজ ওঠা-নামা করতে হয় না, ক্বচিৎ-কদাচিৎ, তাই লিফ্‌টের বেলায় যেদিকের লিফ্‌ট চাই, সেদিকের পাই না, এমনটা ভালভাবে মালুম হয় না আমাদের। কিন্তু বাসে ট্রামের বেলায়? হ্যাঁ, প্রতিদিন, বলতে গেলে, প্রতিবার বাসে চড়ার সময়ে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি।

গোলপার্কে দাঁড়িয়ে আছি। দুটো স্টপ আগে বাস টারমিনাস, সেখান থেকে বাস আসবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল। বাসের আর দেখা নেই। অথচ উল্টোদিকে তাকিয়ে দেখি, যে বাস চাই, সেই বাসই ফিরে আসছে টারমিনাসের দিকে, দমদম এয়ারপোর্ট

থেকে। আবার দমদমের কাছাকাছি এক বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি এই একই রুটের বাস ধরে গোলপার্কের বাসায় ফিরে আসব বলে। সত্যি কথা বলছি, দমদম থেকে আসছে এমন বাস একটাও নজরে পড়ে না। অথচ গোলপার্ক থেকে দমদমের পথের বাস ঠিক নজরে আসবে। রাগ হয়। অবাক হই। কারণ খুঁজে পাই না। কিন্তু মেনে না নিয়ে তো কোনো উপায় নেই।

শুধু দমদম, গোলপার্ক নয়, পাইকপাড়া, বালিগঞ্জ, কুঁদঘাট, বরাহনগর, হাওড়া, বালিখাল সব জায়গাতেই আমরা এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ি। সব জায়গাতেই আমাদের এই অভিজ্ঞতা।

কেন, কেন, এরকম হয়!

লিফ্‌ট ধরে বিজ্ঞানীদের আলোচনা নিশ্চয় আমাদের কৌতূহল মেটাবে।

দুটি বিজ্ঞান সচেতন মানুষ লিফ্‌টের সমস্যাটিকে পট বদলে নিয়ে এলেন রেলপথের উপরে, মূল হেঁয়ালিটি কিন্তু একই রইল।

গল্পের ছলে তাঁরা এটিকে সাজালেন এইরকম ভাবে ঃ

কোনো শহরে উইলিয়াম জনসন নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার বাস করতেন। এই ইঞ্জিনীয়ারটি রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার। যে মেন লাইনে তিনি কাজ করতেন সে লাইনটি গিয়েছিল শহরের ভেতর দিয়ে। রেলের নাইট ডিউটি দিতে দিতে জনসনের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, রাতের ঘুম ভাল হত না। চোখের পাতা না বুজলে জনসন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। কতকাল আগে রেলের চাকরিতে ঢুকেছেন, এই চাকরিতেই জীবন কাটিয়ে শেষকালে রিটায়ার! লাইন তাঁকে টানতো। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলে আসতেন রেলওয়ে ক্রশিংয়ের দিকে। ট্রাফিকের লাল আলো রক্তচক্ষুর মত দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রং বদলে যেত। তিনি দেখতেন, ঝড়ের আওয়াজ তুলে, দুনিয়া কাঁপিয়ে যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে একদিন একটা খট্‌কা লাগল। মনে হল

তাঁর, পূর্বমুখী ট্রেনের সংখ্যাই যেন বেশি পশ্চিমমুখী ট্রেনের চেয়ে। অথচ লাইনের লোক তিনি, টাইম টেবিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি ভাল করেই জানতেন পূর্বমুখী ট্রেনের সংখ্যা যত, পশ্চিমমুখী ট্রেনের সংখ্যা ঠিক তার সমান। তা ছাড়া একটা পূর্বমুখী ট্রেন যাওয়ার পরে আর একটা পশ্চিমমুখী ট্রেন আসবে। তাহলে? গোনায় কি তিনি ভুল করলেন? নিশ্চিন্ত হবার জন্যে তিনি একটা নোটবুক রাখলেন আর একটা পেনসিল। যদি পূর্বমুখী ট্রেন দেখেন তাহলে লিখবেন 'পূ'। পশ্চিম-মুখী ট্রেন দেখলে 'প'। সপ্তাহের শেষে ৫টা 'পূ' আর ২ টো 'প'। তার পরের সপ্তাহের হিসেবেও ফলাফল মোটামুটি একই। তাহলে তাঁর অনুমানই ঠিক। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণটা কি? এমন কি হচ্ছে যে, রাতের পূর্বমুখী ট্রেন যাওয়ার ঠিক আগে তিনি এসে দাঁড়াচ্ছেন রেলওয়ে ক্রশিংয়ে?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তিনি ভাবলেন, তথ্যভিত্তিক একটা চার্ট তিনি তৈরী করবেন। না, শুধু রাতের হিসেবটুকু রাখবার জন্যে নয়, সকাল-রাত সব সময়ের জন্যে। নিজে তিনি চার্ট তৈরি করলেন না। এক বন্ধুকে বললেন, ওহে, তুমি আমাকে যেমন ইচ্ছে সময় বসিয়ে সময়ের একটা টাইম টেবিল তৈরি করে দাও, যেমন সকাল ৯-৩৫, দুপুর ১২টা, অপরাহ্ণ ৩টে ৭ মিনিট এইরকম ভাবে।

জনসন সময় ধরে গেলেন রেলওয়ে ক্রশিংয়ের কাছে—দেখি কোন্ দিকের ট্রেন আগে আসে, পূর্বদিকের না পশ্চিমদিকের! কিন্তু ফলাফল হল আগের মতই। ১০০টা ট্রেনের হিসেব নিয়ে তিনি দেখলেন, ৭৫টা ট্রেন পূর্বমুখীন ট্রেন আর মাত্র ২৫টা পশ্চিমের গাড়ি। একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন জনসন। কাছের স্টেশনে তিনি দৌড়ে গেলেন। কয়েকটা পশ্চিমমুখী ট্রেন কি বাতিল করা হয়েছে? কিম্বা অন্য কোনো পথ ঘুরে সেগুলো এখন চলেছে?

না, সে-রকম তো কিছু হয়নি। ট্রেন চলেছে একেবারে হিসেব মত। যতগুলি পূর্বমুখী গাড়ি, পশ্চিমমুখী গাড়ির সংখ্যা ঠিক তারই

সমান, কম-বেশি নেই একটিরও। তাছাড়া একটা পূর্বমুখী গাড়ির পরে একটা পশ্চিমের গাড়ি সময় ধরে যাচ্ছে, আসছে। গোলমাল নেই কোথাও। তাহলে তাঁর হিসেবে এ-রকম একটা অবস্থা হচ্ছে কেন?

দিশেহারা হয়ে জনসনের রাতের ঘুম পর্যন্ত একেবারে ছুটে গেল। শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। স্থানীয় ডাক্তার ছিলেন সখের গণিতবিদ্। প্রচুর ধাঁধা সংগ্রহ করতেন তিনি।

জনসন তাঁর কাছে গিয়ে শরীরের কথা বললেন। কারণ হিসেবে রেলের যাতায়াত নিয়ে গোলমেলে হিসেবটাও তুলতে হল তাঁকে।

ডাক্তার চেয়ারে গুছিয়ে বসে বললেন, এ ধাঁধাটি নতুন। রোগ সারানোর জন্যে আগে ধাঁধাটির সমাধান করা দরকার।

আচ্ছা, সময় ধরেই অবস্থাটা ব্যাখ্যা করা যাক, ডাক্তার বললেন। ধরে নিই, পূর্বমুখী ট্রেন চলেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়; ১২টায়, ১টায়, ২টায়, ৩টায়—২৪ ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় আর পশ্চিমের ট্রেন প্রতি সোয়া ঘণ্টায়। ১২টা বেজে ১৫ মিনিটে, ১টা বেজে ১৫ মিনিটে, এইরকম ভাবে।

জনসন যদি রেলওয়ে ক্রশিংয়ে আসেন কোনো ঘণ্টা আর সোয়া ঘণ্টার মধ্যে, তাহলে প্রথম যে ট্রেনটা আসবে, সেটা নিশ্চয় হবে পশ্চিমমুখী। কিন্তু সোয়া ঘণ্টার পর থেকে পরের ঘণ্টার মধ্যে এলে তিনি প্রথমে দেখবেন পূর্বের গাড়ি।

যদি জনসন রেলওয়ে ক্রশিংয়ে যেতেন সময়ের হিসেব না করে তাহলে ঘণ্টা থেকে সোয়া ঘণ্টা অর্থাৎ প্রথম পনেরো মিনিট যাওয়ার সম্ভাবনা যতটা তার পরের সময়ে অর্থাৎ পরের ৪৫ মিনিটে যাওয়ার সম্ভাবনা তার চেয়ে তিনগুণ বেশি। তাহলে পূর্বমুখী ট্রেন পাওয়ার সম্ভাবনা পশ্চিমমুখী ট্রেনের চেয়েও তিনগুণ বেশিই হবে। ডাক্তার জনসনকে বোঝালেন যে, জনসনের বেলায় এই-ই ঘটেছে।

গণিতে আনাড়ি জনসন কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলেন না। জনসন প্রশ্ন তুললেন, যদি একটা পূর্বমুখী ট্রেন পাওয়ার সম্ভাবনা

পশ্চিমমুখী ট্রেনের চেয়ে তিনগুণ বেশি হয়, তাহলে পূর্বমুখী ট্রেনের সংখ্যা কি তিনগুণ নয়? তিনগুণ না হলেও তিনগুণের কাছাকাছি?

মৃদু হেসে ডাক্তার ব্যাপারটা খোলসা করলেন। প্রথম যে ট্রেনটা যাবে, সেটা খুব সম্ভবত পূর্বমুখীই হবে। কারণ প্রথম ১৫ মিনিটে জনসনের স্টেশনে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা যতটা, পরের ৪৫ মিনিটে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা তার চেয়েও নিশ্চয়ই বেশি এবং তিনগুণ বেশি। আর এই ৪৫ মিনিটের শেষেই আসবে পূর্বমুখী ট্রেন। কিন্তু এই পূর্বমুখী ট্রেনের জন্যে জনসনকে গড়ে বেশি সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

কিভাবে? জনসন অবাক হলেন।

ডাক্তার ধৈর্য ধরে ব্যাপারটা বোঝাতে আরম্ভ করলেন।

যদি আপনি প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যে আসেন, তাহলে আগে আপনি পশ্চিমমুখী ট্রেনই দেখছেন, আর এই পশ্চিমমুখী ট্রেনের জন্যে কখনোই পনেরো মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। তারপরে আপনি যদি মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছোন, তাহলে সাড়ে সাত মিনিটেই ট্রেন পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পূর্বমুখী ট্রেনের বেলায় কি হচ্ছে? পশ্চিম-মুখী গাড়ি পার হয়ে যাওয়ায় ঠিক পরেই যদি আপনি এসে পৌঁছোন, তাহলে আপনাকে পূর্বের গাড়ির জন্যে প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সব সময়ে যে ৪৫ মিনিট তা নয়, কিন্তু পূর্বের গাড়ির জন্যে নিশ্চয় অপেক্ষা করতে হয় বেশি সময় ধরে।

ডাক্তারের কথা শুনে ইঞ্জিনীয়ার জনসনের মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। চিকিৎসা ঠিকই হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু আমরা যখন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকি বাসের অপেক্ষায়, উত্তরের বাস চাই, আসে দক্ষিণের একই রুটের বাস। পূর্বের বাস চাই, আসে পশ্চিমের সেই রুটের বাস, তখন কি হয়? সেখানে তো সময়ের এ-রকম হিসেব থাকে না। না যানবাহনের, না আমাদের। যানবাহন মর্জিমাফিক, আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে। কখনো

অফিসে, কখনো সিনেমায়, কখনো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।

সময়ের হিসেব না করেও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। ধরে নিই দুটো টারমিনাস ক আর খ। এদের দূরত্ব ২০ মাইল। আমি আছি ক থেকে ৫ মাইল দূরের একটা বাস স্টপে। তাহলে অন্য টারমিনাস অর্থাৎ খ থেকে আমার দূরত্ব ১৫ মাইল। অবস্থাটা এখন কি দাঁড়াচ্ছে? খ থেকে আমি যেখানে আছি তার দূরত্ব, ক থেকে আমি যত দূরে দাঁড়িয়ে, সেই দূরত্বের তিনগুণ দূরত্ব বেশি বলে খ থেকে আমার দিকে যতগুলো বাস আসার কথা, ক থেকে ততগুলো নয়। যদি খ থেকে আমার দিকে ৬টা বাস আসে, তাহলে ক থেকে আসছে ২টো। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে তাই তো দেখি, একই রুটের উল্টো দিকের বাস চলেছে বেশি। এক টারমিনাসের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অন্যদিকে যেতে চাইলে এটা আরও বেশি করে মালুম হবে।

দামী ধাঁধা

আজ থেকে চারশো বছরেরও আগে ছাপা একটি ধাঁধার বই—বইটির নাম, দ্য বুক অফ মেরি রিডল্‌স্‌। শুধু অনেক পুরোনো বই হিসেবেই যে এর দাম, তা নয়, ইতিহাসে এর আলাদা মর্যাদা আছে। শেক্‌সপীয়ার তাঁর 'মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অব উইনসর' নাটকে এই বইয়ের উল্লেখ করেছেন।

নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

ভৃত্য সিম্পল তাঁর মনিব স্লেণ্ডারের কাছে এই ধাঁধার বইয়ের খোঁজে তিরস্কৃত হচ্ছে।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। ছেলে-বুড়ো সকলের জন্যেই মন খুশি করার মত অতি উপাদেয় পরম স্বাদু একটি বই। বারো মাসই সঙ্গে রাখার মত। সেই বই হঠাৎ না পেলে মেজাজ খারাপ হতেই পারে।

যে বই স্লেণ্ডারের মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল, সে বই নিশ্চয়ই শেক্‌সপীয়ারেরও মন কেড়ে নিয়েছিল।

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে।

তা থেকে তুলে দেওয়া নীচের নমুনাটি কিরকম?

পেল তাকে জঙ্গলে
কত যে খুঁজেছে বসে
কিন্তু না পেল বলে
ঘরে তাকে নিয়ে আসে।

এই ধাঁধার উত্তর কি হবে?

সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। জঙ্গলে পাওয়া গেল কিন্তু খুঁজে পেল না বলে বাড়ি নিয়ে আসতে হল।

পায়ে ফোটা কাঁটা ছাড়া এ আর কী হতে পারে?

ধাঁধায় লিউইস ক্যারোল

অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের গল্প শোনেনি বা পড়েনি ছেলে বুড়ো এমন নিশ্চয়ই কেউ নেই। ভাবলে অবাক লাগে। এই গল্প লিখেছেন অঙ্কের এক মাস্টারমশায়। যে সে-বিষয়ের মাস্টারমশায় নন, সাধারণ ছেলেদের কাছে অঙ্কের মত এক ভয়-পাওয়া বিষয়, সেই বিষয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট অব চার্চ নামে একটি স্কুলে। গণিতের মাস্টারমশায় বললেই আমাদের মনে হয়, তিনি কঠিন কঠিন অঙ্ক কষেন। ধারাপাতের নানা সূত্র তাঁর মাথায় গিজ গিজ করছে। অথচ তাঁর কলম দিয়ে এমন সুন্দর লেখা বেরোবে, এমন কথা কে ভাবতে পারে! অথচ অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের লেখক লিউইস ক্যারোল এই অবাক করা দেশে ছেলে বুড়ো সবাইকে নিয়ে গিয়ে একেবারে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

লিউইস ক্যারোল আসলে ছদ্মনাম। অথচ এই ছদ্মনামই তাঁর আসল নামকে ছাপিয়ে গেছে। যদি বলি ক্যারোলের আসল নাম ছিল লুডউইগ ডজসন, তাহলে কজন বুঝতে পারবে যে, এই মানুষটিই আমাদের এই চির পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে ছোটদের জন্যে একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তাঁর জন্ম।

ডজসন যে শুধু অ্যালিসের সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, তা নয়, অঙ্কের অনেক ধাঁধাও তিনি সবাইকে উপহার দিয়ে গেছেন। এমন সব ধাঁধা, যা সকলের মনকে নাড়া দেয়, ভাবায়, খুশি করে।

অ্যালিসের আজব দেশেও এ-রকম কিছু কিছু ধাঁধা আছে।

এমন কোন্ আজব ঘড়ি আছে, যাতে দিন বলা যায়, কিন্তু সময় বলা যায় না। যে কারোর হাতে এ-রকম ঘড়ি দেখলে সবাই অবাক হবে, অ্যালিসও হয়েছিল।

কিন্তু অবাক হওয়ার কি আছে? ঘড়ির মালিক রাগ করতে পারে অ্যালিসের উপরে। সব ঘড়িতে সব কিছুই বলা যাবে, এমন কোনো কথা নেই। আছে যত চলতি ঘড়ি, তাতে কোথাও লেখা থাকে কত সাল চলছে এখন?

এর উত্তর খুবই সোজা। অ্যালিস সেই সোজা উত্তরই দিয়েছিল, একটা সাল তো অনেকদিনের ব্যাপার।

ঠিক কথা! কিন্তু ঘড়িটা তাহলে কি, যাতে সাল থাকে, দিন থাকে অথচ সময় থাকে না, কটা বাজল—এর উত্তর মেলে না।

এই ঘড়ি ক্যালেণ্ডার ছাড়া আর কি হতে পারে?

আজব দেশে বিচিত্র সব ধাঁধার ছড়াছড়ি। কিন্তু সে-সব ধাঁধার কথা না বলে, রীতিমতো মাথা ঘামাতে হয়, লিউইস ক্যারোলের এমন একটা ধাঁধার কথা এখানে শোনানো যাক।

কুঁয়োতে বালতি ডুবিয়ে জল তুলতে গেলে অনেক সময়ে কপিকল লাগানো হয়, যাতে জল ভর্তি ভারি বালতি তুলতে পরিশ্রম কিছুটা কমে। এই কপিকলে থাকে লোহার চাকতি—যে চাকতির ভেতর দিয়ে দড়ি বাঁধা বালতি চলে যায় কুঁয়োর ভেতরে আর অন্যদিকে আমাদের হাতের টানে টানে যে বালতি একটু একটু করে উপরে উঠে আসে।

লিউইস ক্যারোল বলছেন, দড়ি আর কপিকল এমন নেওয়া হয়েছে যাতে কপিকলের উপরে দড়ির যাতায়াত স্বচ্ছন্দ। এইবার এই কপিকলের একদিকে ১০ পাউণ্ডের একটা ওজন চাপানো হলো, অন্যদিকে, না, কোনো ওজন নয়, চাপানো হলো একই ওজনের একটা বাঁদর। তাহলে বাঁদরটার কি হবে?

এখন দড়ির দুদিকের ওজন সমান হলে টানও সমান। তাহলে

বাঁদর উঠবেও না, পড়বেও না। সে থাকবে স্থির। যদি কাউকে, গায়ে সমান জোর আছে এমন দুই বন্ধু তার দুই হাত ধরে দুদিক থেকে টানতে থাকে, তাহলে তার অবস্থাটা কি হবে? সে যেমন এগোবেও না, পিছোবেও না, বাঁদরের অবস্থাও ঠিক সে-রকম। কপিকলের একদিকে ওজন আর অন্যদিকে বাঁদর থাকবে একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থার মধ্যে।

যে উত্তর সকলের জানা, তা তো কোনো ধাঁধা হলো না। এখনও পর্যন্ত বাঁদরকে নিয়ে কোনো ধাঁধা হয়নি। কিন্তু বাঁদর যদি দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে? তখন? তখন তার অবস্থাটা কি হবে? সে কি হুড়মুড় করে নীচে নেমে আসবে? নাকি উপরে উঠে যাবে ইচ্ছেমতো? নাকি উঠবেও না, নামবেও না, যেমন আছে তেমনিই থাকবে।

ব্যাপারটা যে যথেষ্ট গোলমেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গণিত সম্পর্কে কৌতূহলী অনেকেই ধাঁধাটির দিকে ঝুঁকলেন আর মজার কথা, এক একজনে একেক রকমের উত্তর দিতে লাগলেন।

কেউ বললেন, বাঁদর উঠবার চেষ্টা করতে পারে ঠিকই, কিন্তু উঠবার চেষ্টা করলেই উল্টে ওজনই উপরদিকে উঠে যাবে জোর গতিতে।

উহু, আরেকজন বললেন, উঠবে ঠিকই কপিকলের অন্যদিকের ওজনও, তবে বাঁদরের চেয়ে তাড়াতাড়ি নয়। বরং বাঁদর যে গতিতে উঠছে, ঠিক সেই গতিতেই।

কিন্তু বাঁদরের সঙ্গে সঙ্গে ওজন উঠবে এমন কথাই সবাই মেনে নিতে পারলেন না। কেউ আবার এমনও বললেন, বাঁদর উঠবার চেষ্টা করলেই ওজন নেমে আসবে।

ফলে গোলমেলে এক বিষয়ের জট তো আল্‌গা হলই না, বরং জট আরও পাকিয়ে উঠতে লাগল।

এক বিশিষ্ট কারিগরিবিদ্ ব্যাপারটাকে আরও অন্যভাবে দেখলেন।

তিনি বললেন, দু-দিকে সমভার, এই অবস্থায় বাঁদরের উঠবার চেষ্টা, অনেকটা একটা মাছির দড়ি বেয়ে ওঠার মতন, নতুন কিছু ঘটবে না সে-সময়ে। গণিতবিদ্ অবশ্য বাঁদরের ওটা-নামাটাকে গতির ব্যস্ত অনুপাত দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

ধাঁধার আসল সমাধান কি ?

আমেরিকার বিশিষ্ট ধাঁধাবিদ্ স্যাম লয়েড এই ধাঁধাটির একটা উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন, বাঁদর যতই দড়ি বেয়ে উঠবে, ততই সে আরও দ্রুতগতিতে নামবে। কিন্তু ধাধার এ সমাধানও ঠিক নয়।

কৌতূহলী বিভিন্ন গণিতবিদদের আলোচনার মাধ্যমে ধাঁধার আসল উত্তর অবশ্য জানা গেছে। দড়ি বেয়ে বাঁদর যেভাবে ইচ্ছে ওঠার চেষ্টা করুক না কেন, দড়ি বেয়ে বেয়ে আস্তে উঠুক, বা তাড়াতাড়ি উঠুক বা সে উঠুক লাফ দিয়ে দিয়ে দুই-ই বরাবর থাকবে উল্টোদিকে।

শুধু ছোটদের গল্প লেখক হিসেবে নয়, ধাঁধার জগতে লিউইস ক্যারোল একটা বিশিষ্ট নাম।

গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার উপরে তাঁর কিছু বিশিষ্ট ধাঁধা আছে।

একটা ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে, একদমই চলছে না সে ঘড়ি। আর একটা ঘড়ি দিনে পাঁচ মিনিট স্লো যায়।

এখন এই দুটো ঘড়ির মধ্যে কোন্ ঘড়িটা বেশি কাজের ?

ধরা যাক, যে ঘড়িটা একদম চলছে না, তাতে ৬টা বেজে ২৫ মিনিট হয়ে আছে। তাহলে ঘড়িটা দিনে দুবার অন্তত ঠিক সময় দেবে। সকালে আর সন্ধ্যায়। কিন্তু যে ঘড়িটা ৫ মিনিট স্লো যায় একদিনে, সারাদিনে সে একবারও ঠিক সময় দেবে না। তাহলে কোন্ ঘড়িটা বেশি কাজের ?

লিউইস ক্যারোলের সব ধাঁধা তাঁর গল্পের মত সহজ নয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি প্রখর হয়, তাহলে আকর্ষণের দিক দিয়ে তা যে ঠিক গল্পের মতনই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরীক্ষার ফল যদি ভাল হয়, কলেজে পড়ার যদি পারমিশান মেলে, তাহলে বন্ধু-বান্ধবের মিলিত উচ্ছ্বাস আর কলরোল সবাইকে টেনে নিয়ে যায় একটা ভালমতো ভোজের দিকে, নদী যেমন সাগর মুখে চলে, উচ্ছ্বাস আর কলরোলের স্বাভাবিক পরিণতি ওই ভোজমুখীন।

১০ বন্ধু চলেছে কাফে ডি মণিকোর দিকে। ছোট রেস্টুরেন্ট, তাতে কি যায় আসে! সম্পর্ক মধুর। চাচার হাতের মোগলাইয়ের কথা ভাবলেই রসনা লুব্ধ। তারপর মেজাজ খুশ, হাতে সময় অফুরন্ত, পরিবেশ অনুদ্বিগ্ন—মোগলাই মুখে দিয়ে পাঁঠার ঠ্যাঙ চিবোতে চিবোতে আড্ডাটা যা জমবে।

চাচার দোকানের স্পেশাল কাঠের লম্বা টেবিল কিছুটা নড়বড়ে। তার এক ধারেই ১০টা টিনের চেয়ার বসানো। লক্ষ্য খাওয়া, জায়গা তো নয়। যে কেউ যে কোনো জায়গায় বসে পড়লেই হয়। কিন্তু ধারের দুটো চেয়ারের আলাদা টান আছে। জানালাটা পাওয়া যায়, রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত নজরে আসে। ফলে ওই দুটো জানালা কেউ ছাড়তে রাজী নয়।

মুশকিল বেঁধে গেল। এ বলে, আমি বসবো এখানে, ও বলে আমি। বাসে জানালার ধার যেন, সবাই জায়গাটা পেতে চায়। খাওয়ার জন্যে নয়, হায় বিধাতা, যেন জায়গার জন্যেই চাচার দোকানে সবাই মিলে আসা।

মুশকিল আসান করে দিল চাচা নিজেই। ঠিক আছে, আজ যে যেখানে বসেছো সেইভাবেই থাকো। তোমরা তো আমার দোকানের একদিনের খদ্দের নও, রোজ আসো তোমরা। আজ কিভাবে বসেছো খেয়াল রাখো, খুব ভালো হয়, যদি লিখে রাখো। কালকে এসে আবার অন্যভাবে বোসো। পরশু আবার অন্যভাবে। রোজ এক এক রকম করে। তাহলে জানালার ধারে আজ যারা বসছে রোজ

নিশ্চয় তারা বসবে না। কাল যারা বসবে তাদের যে ওই সিটটা পাকাপাকিভাবে হয়ে যাবে, তাও নয়। এইভাবে রোজ এক এক ভাবে বসবে তোমরা আর সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখবে। আর যেদিন সমস্ত রকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসা শেষ হবে, তার পরের দিন আমি তোমাদের ফিস্ট দেবো, যে সে ফিস্ট নয়, একেবারে গ্রাণ্ড ফিস্ট আর একদম বিনি পয়সায়।

সবাই সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলো, ঠিক বলছো চাচা?

হ্যাঁ, বাবা, বুড়ো মানুষ, বেঠিক কোন্ সাহসে বলি তোমাদের কাছে? তবে তার আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমস্ত রকমভাবে বসতে হবে তোমাদের দশজনকে। কি, রাজি তো?

রাজি নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত রকম ভাবে বসা যায় দশজনে, এক একদিনে তার এক এক রকম বসলে কতদিন লাগবে সব মিলে? বন্ধুরা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

দশ দিন, পনেরো দিন, কুড়ি দিন? নাকি তার চেয়েও বেশি?

পরীক্ষায় পাশ করা অঙ্কের বুদ্ধিতে শান দেওয়া ছেলেরা ভাবতে শুরু করলো।

যদি দুটো লাল, নীল পেনসিল নিই, তাহলে এই দুটো পেনসিলকে সাজানো যেতে পারে ক' ভাবে?

লাল নীল
নীল লাল

অর্থাৎ দু'ভাবে।

যদি দুটোর সঙ্গে একটা কালো পেনসিল নিয়ে পেনসিলের সংখ্যাকে বাড়িয়ে তিন করি, তাহলে এই তিনটে পেনসিলকে কত ভাবে সাজানো সম্ভব?

লাল নীল কালো
লাল কালো নীল
নীল লাল কালো

নীল কালো লাল
কালো নীল লাল
কালো লাল নীল

অর্থাৎ সবশুদ্ধ ছ' ভাবে এই তিনটে পেনসিলকে সাজানো যেতে পারে। এই ৬-কে লিখতে পারি ৩ × ২ হিসেবে।

চারটে পেনসিলের বেলায় কি হবে? ধরে নিই, লাল, নীল, কালোর সঙ্গে আর একটা পেনসিল বসাচ্ছি। সেটা বেগুনি। না, কত রকমভাবে সাজানো সম্ভব আমরা সাজিয়ে সাজিয়ে দেখবো না। বরং অঙ্কের নিয়মে বের করার চেষ্টা করি।

প্রথমে বেগুনি পেনসিলটাকে একধারে রাখি। আর লাল, নীল, কালো পেনসিলকে যত ভাবে সাজানো সম্ভব, তত ভাবে সাজাই। তিনটে পেনসিলকে নিজেদের মধ্যে কত ভাবে সাজানো যায়, জানি আমরা ঠিক ৬ ভাবে। তাহলে তিনটে পেনসিলকে ৬ ভাবে সাজানো হল আর তার সঙ্গে বেগুনি রংয়ের পেনসিলটাকে একধারে বসিয়ে যাচ্ছি। মনে করে নিই, সবগুলো পেনসিলের একেবারে ডান ধারে বসাচ্ছি সেটাকে। চারটে পেনসিল নিয়ে এইভাবে ছ' রকম সাজানো হল।

কিন্তু শুধু ডান ধারে বসাবো কেন বেগুনি পেনসিলটাকে? বেগুনি পেনসিলটাকে বসাতে পারি একেবারে বাঁ-দিকেও। তা ছাড়া আরও দুটো বসানোর জায়গা আছে। প্রথম আর দ্বিতীয় পেনসিলটার মাঝখানে বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেনসিলটার মাঝে। তাহলে বেগুনি পেনসিলটার সবশুদ্ধ চারটা অবস্থান। আর প্রত্যেকটা অবস্থানের জন্যে লাল, নীল, কালো পেনসিল সাজাচ্ছি ছ' ভাবে। বেগুনি পেনসিল একেবারে বাঁ দিকে রাখলেও ছ' ভাবে। মাঝের দুটো অবস্থানের প্রত্যেকটার জন্যেও ছ' ভাবে।

তাহলে সবশুদ্ধ কত ভাবে সাজাচ্ছি চারটে পেনসিলকে ৬ × ৪ = ২৪ রকমে। আর এই ২৪কে লিখতে পারি ৪ × ৩ × ২ × ১—এইরকমে।

তিনটে পেনসিলের বেলায় দেখেছি, সাজানো যায় সবশুদ্ধ ছ' ভাবে অর্থাৎ ৩×২×১ ভাবে, দুটো পেনসিলের বেলায় দু' ভাবে অর্থাৎ ২×১ ভাবে। তাহলে চারের বদলে যদি পাঁচটা আলাদা রংয়ের পেনসিল, না, পেনসিল নয়, যদি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটা কিছু নিয়ে সাজানোর চেষ্টা করি, কত রকমভাবে সাজাতে পারবো সেই পাঁচটা জিনিষকে? নিশ্চয় ৫×৪×৩×২×১ অর্থাৎ ১২০ ভাবে। ছটা আলাদা জিনিষের বেলায় ৬×৫×৪×৩×২×১ অর্থাৎ ৭২০ ভাবে।

এইবার দশজন ছেলের কথায় ফিরে আসা যাক। দশটা ছেলে নিজেদের মধ্যে কত ভিন্ন রকমে বসতে পারবে?

নিশ্চয়ই তারা বসবে ১০×৯×৮×৭×৬×৫×৪×৩×২×১ ভাবে। সংখ্যায় কত এ জানবার জন্যে কষ্ট করে গুণটুকু করতেই হবে লক্ষের ঘরের সংখ্যা, মান আসছে ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০০।

তাহলে দশজন ছেলে রোজ যদি এক এক রকম ভাবে বসে, আ ঝড় জল বৃষ্টি কোনো দিনেই যদি হাজিরা থেকে কামাই না কর তাহলে কত দিন, না, দিনে নয়, দিনে হলে বিরাট একটা সংখ্যা হ যাবে, কত মাসে, মাসও কি ঠিক হবে, তার চেয়ে বলি, কত বছরে তা সমস্ত রকমভাবে বসা শেষ করতে পারবে?

শুনলে অবাক হবে, ১০ হাজার বছরের কাছাকাছি সময় লাগ তাদের। ব্যাপারটা কি সহজ হলো? ১, ২, ৩ বছর নয়, একেবা ১০ হাজার বছর। এক ইহলোক যদি একেবারে সুন্দরভাবে ১০০ ব ধরি, তাহলেও এই পৃথিবীতে একশো বার আসতে হবে জন্ম নিয়ে।

চাচার গণিতের জ্ঞান-গম্যি পাশ করা ছেলেদের চেয়ে নিশ্চয় কি বেশি ছিল। না হলে এমন একটা লোভ দেখাবে কেন, যার ফলবার সম্ভাবনা একেবারে কিছুই নেই।

কিন্তু লোভে পড়ে বন্ধুপ্রিয় বুদ্ধিমান ছেলেরা যদি আরও ভারি করতে চাইত, এ বলতো, আমি নিয়ে আসি আমার এক বন্ধু ও বলতো আমি নিয়ে আসি আর একজনকে, তাহলে? দলে

সবশুদ্ধ হতো বারো জন? তখন প্রত্যেকদিন এক এক রকম ভাবে বসলে কতদিনে সব রকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসা শেষ হত? আগে যত দিন পেয়েছি, তাকে ১১ × ১২ দিয়ে গুণ করলে, তবেই বেরোত নির্দিষ্ট দিন।

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! বিনি পয়সায় ভোজ খাওয়া এমনিতেই ভাগ্যে নেই। তখন তা সরে যেতো, আরও অনেক অনেক দূরে।

গণিতের জগতে এই সাজানোর ব্যাপারটা শুধু ভোজের আসনেই বাঁধা পড়েনি, এর বিস্তৃতি বহুদূর পর্যন্ত।

দশটা খাম আছে—তাতে আছে দশটি ঠিকানা লেখা। দশটি নেমন্তন্ন কার্ড ভরা হবে দশটা খামে। কত ভাবে ভরা সম্ভব?

নেমন্তন্ন কার্ড, সে কার্ড পৈতেরই হোক, বা জন্মদিনেরই হোক, কিছু যায় আসে না, যে কোনো কার্ডই ভরা যেতে পারে যে কোনো খামে—যেমন যে কোনো ছেলে যে কোনো চেয়ারে বসতে পারে, ঠিক সেইভাবে। তাহলে আগের মত সংখ্যা আসবে ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০০।

১, ২, ৩, ৪—এই চারটে অঙ্ক দিয়ে চার অঙ্কের কতগুলি আলাদা আলাদা সংখ্যা তৈরি করা সম্ভব? কতগুলি সংখ্যা হবে, তা বের করবো কি করে?

নেমন্তন্ন কার্ডের বেলায় যা করেছি, বিনে পয়সার ভোজের বেলায় যা হয়েছে, এখানেও হবে ঠিক সেইভাবে। কিন্তু নেমন্তন্ন করার সময়ে কার্ড ভরার জন্যে খাম ছিল, চাচাজীর রেস্টুরেণ্টে বসবার জন্যে টিনের চেয়ার ছিল, এখানে শুধু চারটে সংখ্যা, এই চারটে সংখ্যার জন্যে কি আছে, তাদের আধার কি?

এই চারটে সংখ্যার আধার এককের স্থান, দশকের স্থান, শতকের স্থান আর সহস্রের স্থান। এই চারটে স্থানে চারটে সংখ্যা বসাবো যতভাবে সম্ভব।

কত ভাবে সম্ভব, তা কি আর নতুন করে বলতে হবে? চারটে

স্থানের জন্যে সবশুদ্ধ সংখ্যা পাবো ৪×৩×২×১ অর্থাৎ ২৪টা। এইভাবে পাঁচটা অঙ্ক দিয়ে পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা কটা হবে তাও বের করা যায়। ছটা অঙ্ক দিয়ে ছ' অঙ্কের সংখ্যাও।

কিন্তু যদি বলি, কোনো সেকসনের রেল লাইনের উপরে দশটা রেলওয়ে স্টেশন আছে। এর যে কোনো একটা স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে গেলে রেল কোম্পানিকে কতগুলো টিকিট ছাপাতে হবে?

ব্যাপারটা এবার আগের থেকে একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। দশটা স্টেশনের যে কোনো স্টেশন ধরি না কেন, সেখান থেকে অন্য যে কোনো স্টেশনে যাওয়ার জন্যে নটা টিকিট অর্থাৎ ন' ধরনের টিকিট লাগবেই। তাহলে প্রত্যেকটা স্টেশনেই ন' ধরনের টিকিট, দশটা স্টেশনেরই জন্যে সবশুদ্ধ নব্বুই ধরনের টিকিট রাখতেই হবে রেল কোম্পানিকে।

এবারে আর একটু অন্য ধরনের হিসেবে আসা যাক। আই এফ এ যে লীগ ম্যাচের ব্যবস্থা করে থাকে প্রতি বছরে, তাতে রাজ্যের মানুষের কৌতূহল। কতগুলো টিম খেলে সেই লীগে? ঠিক নেই। লীগের নিয়ম বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে লীগে দলের সংখ্যারও হেরফের ঘটে। তবু হিসেবের সুবিধের জন্যে ধরে নিই, লীগে আছে কুড়িটা টিম। আই এফ এ-কে লীগ শেষ করতে হলে সবশুদ্ধ কতগুলো খেলার ব্যবস্থা করতে হবে? ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে একবার হিসেব করে দেখা যাক। প্রত্যেকটা টিমকেই খেলতে হচ্ছে অন্য টিমের সঙ্গে। কিন্তু কোনো দুটো দলই পরস্পরের মধ্যে দুবার মাঠে খেলছে না। টিমগুলোকে ১, ২, ৩.....এইভাবে ২০ পর্যন্ত নাম দেওয়া যাক।

যদি আগে ১ নম্বর টিমের সবগুলো খেলা আই এফ এ খেলিয়ে দেয়। তাহলে কতগুলো খেলা খেলতে হবে প্রথম দলকে? নিশ্চয়ই উনিশটা। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রথম দল খেলবে বাদ বাকী সব ক'টা দলের সঙ্গে, শুধু নিজের সঙ্গে ছাড়া।

সেইজন্যেই উনিশটা খেলা। প্রথম দলের সব খেলা শেষ হলে দ্বিতীয় দলের দিকে তাকানো যাক। কটা খেলা খেলবে দ্বিতীয় দলে? প্রথম দলের সঙ্গে তাকে আর খেলতে হচ্ছে না। নিজের সঙ্গেও খেলার কথা ওঠে না। তাহলে প্রথম দলের সব খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে খেলতে হবে বাকি আঠারোটা দলের সঙ্গে।

মনে করা যাক, দ্বিতীয় দলেরও সবগুলো খেলা আই এফ এ খেলিয়ে দিয়েছে প্রথম দলের খেলা শেষ হবার পরেই। তাহ'লে খেলাতে হবে এবার তিন নম্বর দলটিকে। তিন নম্বর দলকে কি আর প্রথম দুটো দলের সঙ্গে খেলতে হচ্ছে? না, প্রথম দলের উনিশটা খেলা হবার সময়ে তিন নম্বর দলেরও খেলা আছে। দ্বিতীয় দলও তার আঠারো খেলার মধ্যে তিন নম্বর দলের সঙ্গে খেলেছে। তাহলে প্রথম দুটো দলের সব খেলা হয়ে যাওয়ার পরে তিন নম্বর দলকে আর খেলতে হবে বাকি সতেরোটা দলের সঙ্গে।

এইভাবে হিসেব করলে দেখতে পাবো, প্রথম তিনটি দলের সব খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে চতুর্থ দলকে তার খেলা শেষ করবার জন্যে খেলতে হবে আর ষোলটা খেলা। এগিয়ে যাওয়া যাক এভাবে। এক একটা করে দলের সব খেলা খেলিয়ে দিয়ে পরের দলটির খেলা খেলানো হবে। তাহলে পাঁচ নম্বর দলটির জন্যে বাকি থাকবে পনেরোটা খেলা, ছ নম্বর দলের জন্যে চোদ্দটা খেলা। এগিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ষোল নম্বর দলের জন্যে বাকি থাকবে চারটে খেলা। সতেরো নম্বরের জন্যে তিনটে খেলা, আঠারো নম্বরের জন্যে দুটো আর উনিশ নম্বরের জন্যে মাত্র একটা খেলা। কুড়ি নম্বর দলের জন্যে আর কি কোনো খেলা বাকি থাকবে? না, থাকবে না।

তাহলে সবশুদ্ধ কতগুলো খেলার ব্যবস্থা আই এফ এ-কে করতে হচ্ছে? প্রথম দলের জন্যে ১৯, দ্বিতীয় দলের জন্যে বাকি ১৮, তৃতীয় দলের জন্যে আর বাকি থাকে ১৭, এইভাবে ৪, ৩, ২, ১। সবশুদ্ধ খেলা পাই ১৯০। কম খেলা নয়। কুড়িটি দল থাকলে আর

প্রত্যেক দলকে অন্য সব দলের সঙ্গে একবার করে খেলতে হলে লীগের খেলা শেষ করবার জন্যে ১৯০টি খেলার ব্যবস্থা করতে হয় আই এফ এ-কে।

কিন্তু লীগের বদলে যদি শিল্ডের খেলা ধরি! শিল্ড মানে খেলা হবে নক আউট ধরনের। যে হারবে, সে একেবারে বাদ চলে যাবে। ধরা যাক, শিল্ডে যোগ দিয়েছে সবশুদ্ধ ৩২টা দল। খেলায় ড্র নেই, রি-প্লে নেই। সব খেলাতেই ফয়সালা—প্রথম সাক্ষাতেই, প্রথম দিনেই। তাহলে বিজয়ী দলের হাতে লোভনীয় শিল্ডটি তুলে দিতে গেলে সবশুদ্ধ কতগুলো খেলার ব্যবস্থা করা দরকার?

লীগে খেলার সংখ্যার হিসেব যেভাবে করা হয়েছে, শিল্ডে তা নয়। শিল্ডের খেলা শুরুর আগে চারটে গ্রুপ করা দরকার। প্রত্যেকটা গ্রুপে আছে আটটা টিম। এই আটটা টিমের মধ্যে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে একটা করে টিম উঠবে সেমি-ফাইনালে। তাহলে সেমি-ফাইনালে সবশুদ্ধ দলের সংখ্যা চার। তার থেকে দুটো টিম ফাইনালে। এই দু-দলের এক দলই হবে শিল্ড বিজয়ী। হিসেব করলে, শিল্ডে কটা খেলার ব্যবস্থা আই এফ এ-কে করতে হচ্ছে তা নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কটা টিম যোগ দিয়েছে শুনেও সঙ্গে সঙ্গেই খেলার সংখ্যা বলে দেওয়া সম্ভব। বত্রিশটা টিমের বেলায় একজনই বিজয়ী হচ্ছে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে সেই টিম সবাইকে হারিয়ে শিল্ড জয় করেছে। সবাইকে হারানো অর্থ বাকি একত্রিশটি টিমকে হারানো। তাহলে সবশুদ্ধ খেলার ব্যবস্থা করতে হবে একত্রিশটি। ৬৪টি টিমের বেলায় ৬৩টি।

এই জাতীয় হিসেব-নিকেশের আরও অনেক ক্ষেত্র আছে। লটারি, লুডোর ছক্কা, তাস খেলা, ভাগ্য-পরীক্ষায় তো বটেই, তা ছাড়া আছে জীবনের আরও নানা সমস্যায়। কিন্তু গণিতবিদেরা কোথাও ব্যর্থ হননি। যখনই এরকম যে কোনো সমস্যা আসে, গণিতবিদেরা সূত্র আর বুদ্ধি দিয়ে তার ঠিক সমাধানটি বের করে ফেলেন।

মাথা ঘামানো ব্যাপার

ডন কুইকসোট বইটির নাম কে না শুনেছে? এটি লেখা মিগুয়েল দ্য থের্ভান্তেস-এর। হাসি-ভরা বিরাট বইয়ের দ্বিতীয় অংশের ৫১ অধ্যায়ে একটা মাথা ঘামানো সমস্যা আছে।

এক কলস্রোতা নদী একটি দেশের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এ-পার ও-পার করার জন্যে আছে একটি সাঁকো। সাঁকোর একদিকে আছেন চারজন বিচারক, অন্যদিকে ফাঁসিকাঠ। ফাঁসিকাঠ নিশ্চয়ই আদর-আপ্যায়ন করার জন্যে নয়।

ওপারে যে যেতে চায়, বিচারকের কাছে তাকে শপথ করে বলতে হবে, কি তার প্রয়োজন, কেন সে যেতে চায় ওপারে।

সত্যি কথা বললে, কোনো সমস্যাই নেই। কিন্তু মিথ্যে কথা বললেই, ওপারে ঝোলানো ওই ফাঁসিকাঠ—তাতেই লটকানো হবে মিথ্যেবাদীকে।

সত্যি কথা বলে বহু লোকই যাতায়াত করে। বিচারকরাও তাঁদের ছেড়ে দেন স্বচ্ছন্দে। কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি। কিন্তু একদিন হোলো কি, নদী পার হতে এসে একটি লোক শপথ নিয়ে বললো, অন্য পারে সে যেতে চায় ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্যেই।

বিচারকেরা মাথা চুলকোতে লাগলেন। এ তো ভয়ানক ফ্যাসাদ। সত্যি শপথ করলে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না। অথচ লোকটি শপথ নিয়েই বলছে সে ফাঁসিতে ঝুলতে চায়। কি করবেন বিচারকেরা?

সমস্যার সমাধান করবার ভার পড়ল ডন কুইকসোটের সাকরেদ সান্থো পান্থার উপরে।

সান্থো কিভাবে লোকটার বিচারের ব্যবস্থা করলো?

যেখানে বিচার গোলমেলে বলে মনে হয়, সেখানে ক্ষমার মাহাত্ম্য প্রচার করাই বোধহয় সবদিক দিয়ে ভাল। তাতে আইন মানা হোক বা না হোক, ন্যায়নীতি রক্ষা পাক বা না পাক, বিচারকে কেউ খাটো করে দেখে না। ফলে রক্ষা পেয়ে গেল লোকটি।

কোন্ বার

পাঁচ, দশ, পঁচিশ, তিরিশ বছর তো দূরের কথা, যদি বলা হয়, গত বছর আজকের দিনটি কি বার ছিল, তা বলতে গেলেই তুমি হিমসিম খেয়ে যেতে পারো। ইংরেজি মাসে দিনের সংখ্যা ঠিক (শুধু ফেব্রুয়ারি ব্যতিক্রম) কিন্তু বার তো ঠিক থাকবে না, ঠিক থাকার কথাও নয়। সেইজন্যেই সকলের এই অসুবিধে।

তবু সংখ্যাবিদেরা সাল, তারিখ শুনে বার বলার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। সাল, তারিখ বলবো, সঙ্গে সঙ্গে বারটি বেরিয়ে আসবে— শুনলে অবাক হওয়ার কথা নয় কি? অবাক করাও যায় সবাইকে এ দিয়ে।

সাল, তারিখ বলার কয়েকটি কৌশল আছে। কিন্তু তার মূল এক। কিন্তু সবচেয়ে সহজ যে উপায়, তার কথাটাই এখানে বলবো।

আজ থেকে কত বছর আগে পর্যন্ত সাল, তারিখ বলতে পারলে তুমি খুশি হবে? পঞ্চাশ বছর? না কি তার চেয়েও বেশি? একশো বছর? এই পদ্ধতিতে সাল তারিখ তুমি বলতে পারবে একশো বছরেরও আগের সময়ের—১৮৬০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে কোনো বছরের, যে কোনো দিনের। নিশ্চয় এই তালিকাতেই সবাইকে খুশি করা যাবে।

সবাইকে সাল, তারিখের এই খেলা বা ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করতে গেলে একটু কষ্ট করে কিন্তু তিনটি তালিকা মনে রাখতে হবে। প্রথম তালিকাটিকে তালিকা হিসেবে নাও ধরতে পারো।

এতে আছে ৭ আর ৭-এর তিনটি গুণিতক ১৪, ২১ আর ২৮।

দ্বিতীয় তালিকায় আছে:

জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৩
মার্চ	৩
এপ্রিল	৬
মে	১
জুন	৪
জুলাই	৬
অগাস্ট	২
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	০
নভেম্বর	৩
ডিসেম্বর	৫

তৃতীয় তালিকাটি একটু জটিল। একশো বছরের চেয়ে বেশি সময়ের হিসেব দিতে গেলে স্মৃতিতে একটু শাণ দিতেই হবে।

তৃতীয় তালিকাটি হলো:

১৮৬০ / ১৯০০	০
১৮৬৪ / ১৯০৪	৫
১৮৬৮ / ১৯০৮	৩
১৮৭২ / ১৯১২	১
১৮৭৬ / ১৯১৬	৬
১৮৮০ / ১৯২০	৪
১৮৮৪ / ১৯২৪	২
১৮৮৮ / ১৯২৮	০
১৮৯২ / ১৯৩২	৫
১৮৯৬ / ১৯৩৬	৩
১৯৪০	১

বারের হিসেব করবার সময়ে আমরা কিন্তু সব সময়ে সংখ্যাকে ৭-এর চেয়ে কম রাখবার চেষ্টা করবো। তাহলে ৮ পেলে আমরা ৮ থেকে ৭ বিয়োগ করে লিখবো ৮ − ৭ = ১, ১৯ পেলে ১৯ − ১৪ = ৫, ২৪ পেলে ২৪ − ২১ = ৩। ৩০ বা ৩১ পেলে ২৮ বিয়োগ করে ২ বা ৩।

তাহলে এখন বার বলার চেষ্টা করা চলতে পারে। কি, সব কটি তালিকা মনে আছে তো?

যে তিনটি তালিকার কথা বললাম, সেই তিনটি তালিকাতেই তিনটি ধাপের তৈরি। আর এই ধাপের হিসেবের পরে কোনো বছরের একটি নির্দিষ্ট তারিখ কি বারের তা বেরিয়ে আসে।

প্রথম ধাপটি কি?

মাসের যে তারিখটি দেওয়া আছে, তাকে ৭-এর চেয়ে ছোট একটা সংখ্যায় বদলে নিতে হবে। কিভাবে বদলে নিতে হবে, তা তো আগেই বলেছি। প্রথম ধাপের কাজ এখানেই শেষ হলো।

এইবার শুরু হবে দ্বিতীয় ধাপের কাজ। দ্বিতীয় ধাপে কি আছে?

এই ধাপে আছে মাসের তালিকা। ৭-এর চেয়ে ছোট সংখ্যায় কমিয়ে আনার পরে প্রথম ধাপে যে সংখ্যা রইল তার সঙ্গে মাসের উল্টোদিকের সংখ্যাটা যোগ করতে হবে। জানুয়ারির উল্টোদিকে আছে ০, ফেব্রুয়ারিতে ৩। তাহলে যে তারিখের বার বের করবো, সে তারিখ যদি জানুয়ারি মাসের হয়, তাহলে যোগ করবো ০, ফেব্রুয়ারি হলে ৩। অক্টোবর মাস হলেও তালিকায় দেখো যোগ করবো ০, নভেম্বরে ৩, ডিসেম্বরে ৫। এই যোগের পরে সংখ্যাকে আবার টেনে নামাবো ৭-এর চেয়ে নীচে, দরকার মতো ৭ বা তার গুণিতক বিয়োগ করে। এই সংখ্যাকে নিয়েই তৃতীয় ধাপের শুরু।

তৃতীয় ধাপে এবারে বছরকে কাজে লাগাবো। বছরেরও একটা তালিকা আছে। সেই তালিকায় বছরের উল্টোদিকে যে সংখ্যা আছে

সে সংখ্যাকেও যোগ করতে হবে দ্বিতীয় ধাপের শেষে পাওয়া সংখ্যাটির সঙ্গে। কিন্তু যোগ বললেই যোগ করা যায় না। তালিকায় তো সব বছর নেই। ১৮৬০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত যেসব বছরকে শুধু ৪ দিয়ে ভাগ করলে মেলে সেইগুলিতেই আছে কেবল সংখ্যার নির্দেশ।

তাহলে বাকি বছরগুলির বেলায় কি হবে? ১৮৬১, ১৮৯৩, ১৯০১, ১৯৩৯—এদের একটিও তো ৪-দিয়ে ভাগ করলে মিলবে না। এ একটা সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যার কথা এখন থাক। ৪ দিয়ে ভাগ করলে মেলে না এমন সব বছরের কথায় পরে আসব।

আগে ৪ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এই ধরনের বছরের কথা ধরি। এদের প্রত্যেকটির জন্যেই একটা করে সংখ্যা ধরা আছে। এইসব বছরকেই তো আমরা জানি লিপ-ইয়ার হিসেবে। তাহলে লিপ-ইয়ারের বছরগুলিকে একটা ভাগের মধ্যে নিয়ে আসি। কিন্তু এই লিপ-ইয়ারের অর্থাৎ ৪ দিয়ে ভাগ করলে মিলে এমন তালিকার ভেতর থেকেও একটা বছরের কথা আলাদা করে বলতে হবে। সেটি হলো ১৯০০ সাল। এই বছরটি কি লিপ-ইয়ার? ১৯০০ সাল ৪ দিয়ে বিভাজ্য। ১০০ দিয়ে ভাগ করলেও মেলে। কিন্তু ১০০ দিয়ে ভাগ করলে মেলে এমন সব বছরই লিপ-ইয়ার নয়। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ লিপ-ইয়ার, ২০০০ খ্রীস্টাব্দও, কিন্তু ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ নয়। যেসব বছরের শেষে দুটো শূন্য আছে, সেসব জায়গায় লিপ-ইয়ারের জন্য দেখতে হবে ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মেলে কিনা, ১০০ দিয়ে ভাগ করে মিললেও সেই অব্দকে লিপ-ইয়ার বলে ধরা যাবে না।

এবারে এমন একটা বছর নিই, যেটা লিপ-ইয়ার। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ নিশ্চয়ই লিপ-ইয়ার। এর যে কোনো একটা তারিখের বার বের করবো। যদি বলি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ৮ তারিখ কি বার ছিল?

তারিখটা ৮ অর্থাৎ ৭-এর চেয়ে বেশি। তাহলে ৭ বাদ দিয়ে তাকে কমিয়ে আনি ১-এ। এটা হলো বার বের করার প্রথম ধাপ। এবারে দ্বিতীয় তালিকায় দেখি জুন মাসের জন্যে কত ধরা হয়েছে। জুন মাসে আছে ৪। তাহলে ১+৪=৫। ৫ আবার ৭-এর থেকে ছোট। সেইজন্যে ৫ যেমন আছে তেমনিই থাকছে। দ্বিতীয় ধাপের কাজও শেষ হলো। এবারে বছর নেবো। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জন্যে কত নির্দিষ্ট? তৃতীয় তালিকায় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জন্যে ধরা হয়েছে ২। এই ২-কে যোগ করি দ্বিতীয় ধাপের শেষে ৫-এর সঙ্গে। ৫ আর ২-এ ৭। ৭ থেকে ৭ বিয়োগ করলে ০। ০ কোন্ বারকে নির্দেশ করে?

০ বোঝাচ্ছে রবিবারকে। ১ হলে বোঝাবে সোমবারকে। ২, ৩, ৪ যথাক্রমে মঙ্গল, বুধ আর বৃহস্পতিকে। ৫ শুক্রবারকে আর ৬ শনিবারকে।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ৮ তারিখ যদি রবিবার হয়, তাহলে জুন মাসের ১২ তারিখ কি বার? ১২ তারিখ হবে বৃহস্পতিবার। আগের নিয়মে ধাপে ধাপেই আমরা বের করতে পারি।

কিন্তু ওই বছরই জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো দিন বের করতে গেলে কি করবো? একেবারে একই ভাবে কি আগের মত বার বেরিয়ে আসবে?

হ্যাঁ, প্রায় একই ভাবে আসবে। লক্ষ্য করছো প্রায় কথাটা যোগ করেছি। তার মানে সামান্য একটু তফাৎ আছে। সে তফাৎ প্রথম ধাপে বা দ্বিতীয় ধাপে নয়; একেবারে তৃতীয় ধাপে। বছরের তালিকায় যে সংখ্যা আছে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারী মাসের কোনো তারিখের বার বের করতে গেলে তার থেকে ১ কম নিতে হবে।

এখন বল দেখি, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ কি বার?

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ নিশ্চয় লিপ-ইয়ার আর সেই সঙ্গে আছে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস।

প্রথম ধাপ: ৪ (৭-এর থেকে কম বলে কিছু করবার নেই।)

দ্বিতীয় ধাপ: ৪+০=৪ (জানুয়ারিতে ০ আছে বলে ০ নিয়েছি)। ৭-এর থেকে কম, সেইজন্যে যেমন আছে তেমনিই রইল।

তৃতীয় ধাপ: ১৮৮৪-এতে আছে ২। তাহলে ১ কম নেবো, অর্থাৎ নেবো ১। ৪+১=৫। ৫ মানে শুক্রবার।

অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির ৪ তারিখ শুক্রবার।

কিন্তু যেসব লিপ-ইয়ারের জন্যে ০ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট, সেইসব ক্ষেত্রে কি করবো? ০ থেকে তো ১ কমানো যায় না। ১৮৬০, ১৮৮৮ বা ১৯২৮-এর মত বছরগুলি দেখো। এদের প্রত্যেকের জন্যেই ০ ধরা হয়েছে। এই রকম বছরগুলিতে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো তারিখের বার বের করবার সময়ে ০-কে আমরা ধরে নেবো ৭ হিসেবে।

কেন বল তো?

কারণ যখনই আমরা ৭ বা ৭-এর চেয়ে বড় সংখ্যা পাই তখনই ৭ বাদ দিয়ে তাকে ৭-এর চেয়ে ছোট সংখ্যায় নিয়ে আসি। তাহলে ৭-এর বেলায় কি করবো? ৭ থেকে ৭ বিয়োগ করলে পাবো শূন্য। তখন শূন্য নেওয়া বা শূন্যের বদলে ৭ নেওয়া একই কথা।

তখন তৃতীয় ধাপে নেবো ৬।

এখন লিপ-ইয়ার নয় এমন বছরের তারিখ ধরে বার বলার চেষ্টা করবো।

প্রথম দুটো ধাপের কাজ বরাবর সমান। তফাৎ শুধু তৃতীয় ধাপে। প্রথম দুটো ধাপের শেষে যে সংখ্যা বেরোবে, তাকে যোগ করতে হবে তৃতীয় ধাপের সংখ্যার সঙ্গে। তৃতীয় ধাপের সংখ্যাটি পাবো কি করে? বছরটি লিপ-ইয়ার না হওয়ার জন্যে যে বছরটির কোনো মাসের একটি তারিখের বার বের করতে হবে, সেই বছরের আগের লিপ-ইয়ারটি নেবো। এই লিপ-ইয়ারের উল্টোদিকে কোন্

সংখ্যা বসানো আছে? তালিকা থেকে সেই সংখ্যাটি দেখবো। এই সংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে হবে লিপ-ইয়ার আর নির্দিষ্ট বছরটির বিয়োগফল। এখন যোগফল যদি ৭-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ৭ বাদ দেবো। এটিই হবে তৃতীয় ধাপের সংখ্যা।

এবারে একটা তারিখ নেওয়া যাক।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ৩ তারিখ কি বার?

প্রথম ধাপে ৩ ৭-এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ করবার কিছু নেই এখানে।

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে মাসের তালিকা। জুন মাসের জন্যে ৪ নির্দিষ্ট। তাহলে ৩+৪=৭। এখন ৭−৭=০।

এইবারে তৃতীয় ধাপের কথা।

বছরের তালিকায় ১৮৯৮ নেই। ১৮৯৮-এর আগের লিপ-ইয়ার কোন্‌টা? নিশ্চয়ই ১৮৯৬। দুটো বছরের মধ্যে বিয়োগফল ২ আর ১৮৯৬-এর জন্যে ৩। দুইয়ের যোগফল ৫। এর সঙ্গে প্রথম দুটি ধাপের ফল শূন্য যোগ করেও ফল থাকছে ৫। তাহলে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ৩ তারিখ শুক্রবার।

এবারে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মার্চের ১৩ তারিখের বার বের করি।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দ লিপ-ইয়ার নয় আগে এটুকু মনে রাখতে হবে।

প্রথম ধাপ: ৭ বিয়োগ করলে থাকে ৬।

দ্বিতীয় ধাপ: মার্চের জন্যে ধরা হয়েছে ৩। তাহলে ৬+৩=৯। এখন ৯−৭=২।

তৃতীয় ধাপ: ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জন্যে ধরা হয়েছে ০। আবার ২+০=২।

অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মার্চের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার।

এইভাবে আমরা ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যে কোনো বছরের যে কোনো মাসের ইচ্ছেমতো যে-কোনো তারিখের বার বের করতে পারি।

কিন্তু ১৯৪০-এর পরের কোনো তারিখের বার জিজ্ঞেস করলে কি হবে? এমন ভাবে তো আর খেলা দেখানো যায় না যে ১৯৪০-এর পরের কোনো তারিখের বার বলতে পারবো না। যত সাল তারিখ, সব বলতে হবে ১৯৪০-এর আগের কোনো না কোনো সময়ের।

যদি মাঝবয়সী কারোর সঙ্গে আলাপ হয়, যিনি জন্মেছেন ১৯৪০-এর পরে, জন্মের সাল, তারিখ বলে বার জিজ্ঞেস করলে তাঁকে কি এই জবাব পেতে হবে যে, না, ১৯৪০-এর চেয়ে পরের কোনো তারিখের বার বলা যাবে না।

১৯৪০-এর পরের কোনো সালের ইচ্ছেমতো তারিখের বার বলা কঠিন নয়। কিন্তু তার জন্যে বছরের তালিকাটিকে আর একটু বাড়িয়ে নেওয়া দরকার।

১৯৪০-এ ধরা হয়েছে ১। কিন্তু তালিকা দেখলে বোঝা যায় ১৯৪০-এ যেন ধরা উচিত ছিল ০। যদি সত্যিই সেখানে শূন্য থাকতো, তাহলে তো আর কোনো তালিকা করারই দরকার হতো না। ১৮৬০ থেকে যে তালিকা এসেছে ১৮৯৬ পর্যন্ত, সেই তালিকাই ঘুরে গেছে ১৯০০ থেকে ১৯৩৬-এ, আবার সেই সংখ্যার ধারাটা ঘুরে আসতো ১৯৪০ থেকে ১৯৭৬-এ। কিন্তু ১৯৪০-এ ১ ধরার জন্যে ফল যাচ্ছে বদল হয়ে। কি রকম বদল হচ্ছে নীচের তালিকা দেখলেই বুঝতে পারবো:

১৯৪৪	১+৫=৬
১৯৪৮	১+৩=৪
১৯৫২	১+১=২
১৯৫৬	১+৬=৭=০
১৯৬০	১+৪=৫
১৯৬৪	১+২=৩
১৯৬৮	১+০=১
১৯৭২	১+৫=৬
১৯৭৬	১+৩=৪

লিপ-ইয়ার ধরে সংখ্যার যে তালিকা সেই তালিকা একটু বদলাচ্ছে।

এই তালিকা দেখে ঠিক আগের নিয়মেই যে কোনো বছরের যে কোনো মাসের ইচ্ছেমতো তারিখের বার বের করা যায়।

১৯৭৯-এর ১৫ আগস্ট কি বার ছিল? প্রথম ধাপে ১৫ থেকে পাওয়া যায় ১। অগাস্টের জন্যে ২। ২ আর ১-এ ৩। আবার ১৯৭৯ এর জন্যে ১৯৭৬। তাতে আছে ৪। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে দুটি বছরের বিয়োগফল ৩। অর্থাৎ ৪+৩=৭=০। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে আছে ৩। ৩ আর ০ মিলে ৩-ই। তাহলে ১৯৭৯-এর ১৫ অগাস্ট বুধবার।

এতক্ষণ পর্যন্ত সাল, তারিখ আর বারের যত কথা হল, তার শুরু ১৮৬০ থেকে। হ্যাঁ, ১৮৬০ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে কোনো বছরের তারিখ জানলে বারের হিসেব আমরা বলে দিতে পারি সামান্য একটু সময় নিয়েই।

কিন্তু ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের আগের যদি কোনো সালের বারের খোঁজ পড়ে, তখন কি করবো? আমাদের এখনকার প্রচলিত পঞ্জিকা গ্রেগরি পঞ্জিকা শুরু হয় ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর।

কম দিনের কথা নয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কটা বছর, সেই সঙ্গে তিনটে শতাব্দী সম্পূর্ণ পার হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীও পার হওয়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অতি দীর্ঘ ৪০০ বছর। গ্রেগরি পঞ্জিকার প্রারম্ভ কাল থেকে এই দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত যে কোন বছরের ইচ্ছেমতো তারিখের বার বলা যায় না?

হ্যাঁ, তা-ও বলা সম্ভব। এবং তার জন্যে বেশি জটিলতারও দরকার নেই।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করা যাক। না, নতুন নিয়ম কিছু বলছি না। শুধু বছরের হিসেবের সময়ে শতাব্দীর জন্যেও একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে। সপ্তদশ, শতাব্দীর জন্যে ৬, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৪, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ২।

তোমরা হয়তো ভাববে, ১৮৬০ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বছর হিসেব করবার সময়ে তো শতাব্দীর জন্যে সংখ্যা যোগ করিনি। তা করিনি বটে, তবে যোগ করলেও ফল আলাদা আসতো না। তখন অবশ্য বছরের জন্যে সংখ্যা ধরবো শুধু বিংশ শতাব্দীর বছরের তালিকা থেকেই।

বিংশ শতাব্দীর বছরের তালিকা মনে আছে তো?

১৯০০	০
১৯০৪	৫
১৯০৮	৩
১৯১২	১
১৯১৬	৬
১৯২০	৪
১৯২৪	২
১৯২৮	০
১৯৩২	৫
১৯৩৬	৩
১৯৪০	১
১৯৪৪	৬
১৯৪৮	৪
১৯৫২	২
১৯৫৬	০
১৯৬০	৫
১৯৬৪	৩
১৯৬৮	১
১৯৭২	৬
১৯৭৬	৪
১৯৮০	২
১৯৮৪	০
১৯৮৮	৫
১৯৯২	৩
১৯৯৬	১

এইটিই বিংশ শতাব্দীর তালিকা।

আগে আমরা বের করেছি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ৮ তারিখ।

কিভাবে?

তারিখ ৮ : ৮ − ৭ = ১
মাস জুন : = ৪
বছর ১৮৮৪ : = ২
৭

তার মানে ০ অর্থাৎ রবিবার।

শতাব্দী কাজে লাগিয়ে বার বের করবো কিভাবে?

তারিখ আর মাসের বেলায় পদ্ধতিতে তফাৎ নেই কোথাও। তবে বছরের বেলায় ১৯৮৪-এর বদলে ১৮৮৪ দেখবো। তার জন্যে যে সংখ্যা ধরা আছে তা নেবো আর শতাব্দীর সংখ্যা যোগ করবো তার সঙ্গে। তাহলে:

তারিখ ৮ : ৮ − ৭ = ১
মাস জুন : = ৪
বছর ১৯৮৪ : = ০
অষ্টাদশ শতাব্দী : = ২
৭

অর্থাৎ এভাবেও রবিবার।

লিপ-ইয়ারে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসের বেলায় কি করবো? শতাব্দীর সংখ্যা যেখানে যোগ করি, সেখানেও একেবারে আগের নিয়মই। । শুধু বছরের বেলায় বিংশ শতাব্দীর ওই বছরটির জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি নিতে হবে।

আগে আমরা ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ বের করেছি। কিভাবে?

তারিখ ৪ : ৪
মাস জানুয়ারি : ০
বছর ১৮৮৪ : ২
মোট ৬
জানুয়ারি মাস − ১
৫

অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ শুক্রবার।

আবার শতাব্দীর সংখ্যা কাজে লাগিয়ে:

তারিখ ৪ : ৪
মাস জানুয়ারি : ০
বছর ১৯৮৪ : ০
অষ্টাদশ শতাব্দী : ২
৬
জানুয়ারি মাস − ১
৫

অর্থাৎ সেই শুক্রবার।

খেয়াল রাখতে হবে, লিপ-ইয়ার নয় এমন সব বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে এই ১ বিয়োগ করতে হয় না।

শতাব্দীর সংখ্যা কাজে লাগিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর এমন একটা বছর নিই যেটা লিপ-ইয়ারে পড়ে না।

গান্ধীজীর জন্মদিন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবর। এই দিনটির বার কি?

তারিখ ২ : ২
মাস অক্টোবর : ০
বছর ১৯৬৮ : ১
(১৮৬৯-১৮৬৮) : ১
শতাব্দীর সংখ্যা : ২
৬

তাহলে শনিবার ছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবর।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে এবারে পিছিয়ে যাওয়া যাক অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুলাই কি বার?

তারিখ ২৮ :	৫
মাস জুলাই :	৬
বছর ১৯৪৪ :	৬
শতাব্দীর সংখ্যা :	৪
	১৬ অর্থাৎ ২

অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুলাই মঙ্গলবার।

একটা শতাব্দীর মধ্যে যে কোনো তারিখের বার বের করার কোনো অসুবিধে নেই নিশ্চয় কোথাও, কিন্তু একটা শতাব্দীর শেষ-দিন আর পরের শতাব্দীর শুরুর দিন—এই দুটো দিন পর পর বারের হবে তো? শতাব্দীর সংখ্যা বদলে যাবে তখন। ঠিক পরের দিনের বার আসবে তো সেখানে?

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কি বার আসে?

তারিখ ৩১ :	৩
মাস ডিসেম্বর :	৫
বছর ১৯৯৬ :	১
(১৭৯৯-১৭৯৬) :	৩
শতাব্দীর সংখ্যা :	৪
	১৬ অর্থাৎ ২

তাহলে ১৭৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার।

এখন দেখে নেওয়া যাক ১৮০০ সালের ১ জানুয়ারি ঠিক বুধবার হচ্ছে কি না।

তারিখ ১ :	১
মাস জানুয়ারি :	০
বছর ১৯০০ :	০
শতাব্দীর সংখ্যা :	২
	৩

তাহলে ১৮০০ সালের ১ জানুয়ারি বুধবার হচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর যে কোনো বছর নিই এবারে। যদি জিজ্ঞাসা করি, ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কি বার হবে, তাহলে?

তারিখ ১৫ :	১
মাস ডিসেম্বর :	৫
বছর ১৯১২ :	১
(১৬১৩-১৬১২) :	১
শতাব্দীর সংখ্যা :	৬
	১৪ অর্থাৎ ০

তাহলে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর রবিবার।

আর সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতিক্রমের সময়ে কি হবে? বারের হিসেবে গোলমাল হবে না তো? অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বেলায় দেখেছি। না, কোনও অসুবিধা হয়নি, পর পর বার এসেছে সেখানে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশে পৌঁছোনোর সময়ে কি হয় দেখে নিই।

১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কি বার?

তারিখ ৩১ :	৩
মাস ডিসেম্বর :	৫
বছর ১৯৯৬ :	১
(১৬৯৯-১৬৯৬) :	৩
শতাব্দীর সংখ্যা :	৬
	১৮ অর্থাৎ ৪

তাহলে বার পাচ্ছি বৃহস্পতিবার।

পরের শতাব্দীর সূচনায় নতুন দিনটি নিশ্চয় হওয়া উচিত শুক্রবার। নতুন শতাব্দীর সংখ্যা নিয়ে তা একবার পরীক্ষা করে দেখি।

১৭০০ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কি বার ?

তারিখ ১ :	১
মাস জানুয়ারি :	০
বছর ১৯০০ :	০
শতাব্দীর সংখ্যা :	৪
	৫

তাহলে শুক্রবারই হচ্ছে নতুন বছরের প্রথম দিনটি।

বার বলতে হলে, সব সময়ে হাতের কাছে পুরোনো পঞ্জিকা তো পাওয়া যায় না, আর বছর ফুরোলেই ক্যালেণ্ডার পুরোনো হয়, তার জায়গায় নতুন ক্যালেণ্ডার নতুন বছরের খবর দেয়। কিন্তু সাল তারিখের পুরোনো খবর তো কত সময়েই দরকারে লাগে—আমাদের দেশ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট, কিন্তু সেই ১৫ আগস্ট কি বার ছিল, রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাল-তারিখ সবাই জানি, কিন্তু সেটা কোন্ বারে পড়ে ? এইরকম কত প্রশ্ন নিয়ে যে কত সময়ে কথা হয়, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

তখন কেন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বো ? কটা তালিকা আর তার ধাপগুলি যদি মনে রাখি তাহলেই তো বিপদ্‌ভঞ্জন। না, শুধু বিপদ্‌ভঞ্জন নয়, দিগ্বিজয়ও বটে। গণিতের খেলা হিসেবেও এ চমৎকার। আর যে খেলায় প্রয়োজন আছে, চমকও আছে সঙ্গে সঙ্গে, তা তো দিগ্বিজয়ের মতনই, সবার মনকে তা যে স্পর্শ করবে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

১২২৫ খ্রীস্টাব্দে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখ পিসায় এলেন। একা নন, সপারিষদ। পারিষদদলে রাজনীতিবিদ নেই। আছেন গণিত জানা বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা। সম্রাটের সহচর হিসেবে গাণিতিকেরা, শুনলে অবাক হওয়ার কথা বৈকি! তাঁরা সম্রাটকে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন ? অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ?

না, তা নয়।

সম্রাটের আসার উদ্দেশ্য পিসার লিওনার্দোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পিসার লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি নামেও বিখ্যাত, সম্ভবত বর্তমান ছিলেন ১১৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৫০ পর্যন্ত। এই লিওনার্দো ছিলেন সংখ্যার এক বিখ্যাত যাদুকর। ছোট, বড়, যে কোন সংখ্যাতেই তাঁর ছিল অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। যেখানে সাধারণ মানুষের কাছে কোনো সংখ্যা একটা সংখ্যাই মাত্র, তার বাইরে আর কিছু নয়, যেখানে লিওনার্দো যে কোনো সংখ্যাকে দেখতেন সমস্তের মধ্যে একটা অংশ হিসেবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালির অন্তর্গত পিসার এই লিওনার্দোর সংখ্যার ব্যুৎপত্তিকে একবার যাচাই করে দেখতে আসছেন রোমান সম্রাট ফ্রেডেরিখ।

তিনি প্রশ্ন করলেন, বলুন দেখি একটি সংখ্যা, যে সংখ্যার সঙ্গে ৫ যোগ করলে বর্গসংখ্যা, বিয়োগ করলেও বর্গসংখ্যা ?

সংখ্যাটা নিশ্চয় পূর্ণ সংখ্যা নয়। একটু ভেবে লিওনার্দো উত্তর দিয়েছিলেন, সংখ্যাটি হল :

$$\frac{১৬৮১}{১৪৪} \text{ বা } \left(\frac{৪১}{১২}\right)^২ ।$$

৫ বাদ দিলেও বর্গ

$$\frac{৯৬১}{১৪৪} = \left(\frac{৩১}{১২}\right)^২ ,$$

৫ যোগ করলেও বর্গ

$$\frac{২৪০১}{১৪৪} = \left(\frac{৪৯}{১২}\right)^২ ।$$

সংখ্যায় কতটা অধিকার থাকলে এ জাতীয় উত্তর দেওয়া সম্ভব !

লৌকিক বৈজ্ঞানিক ধাঁধা

ধাঁধার জগতে একটা মস্ত বড় অংশ অধিকার করে রেখেছে লৌকিক ধাঁধা। লোকের মুখে মুখে ফিরছে, অন্দরমহলেও আছে সে, বাইরের দালানেও। বিষয়গত জটিলতা কিছু নেই। জীবনের এবং জীবজগতের সকল ক্ষেত্রেই লৌকিক ধাঁধার প্রবেশের অবাধ অধিকার। লৌকিক ধাঁধা আছে ছোটদের মধ্যে, বড়রাও তাকে নিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পায়। বয়সের ভেদাভেদ নেই, অন্দরমহল বাহিরমহল নেই; জাত-ধর্ম, কুলীন-অকুলীন, অভিজাত-অনভিজাত, লৌকিক ধাঁধার জগতে সবাই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কি নেই লৌকিক ধাঁধার মধ্যে? আমরা মানুষেরা তো আছি, আছি চেহারার ভেতর দিয়ে, সম্পর্ক আর আচার-আচরণের ভেতর দিয়ে। তা ছাড়া আছে আরও কত রকমের প্রাণী—পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা। কিন্তু লৌকিক ধাঁধা শুধুই প্রাণিবাচক নয়। লৌকিক ধাঁধার উপকরণ অজস্র তৈজসপত্রও, নানা জিনিসের ব্যবহার, অনেক ধরনের আচরণ, গাণিতিক, গ্রহ-নক্ষত্র আর কিই বা নয়।

লৌকিক ধাঁধার মধ্যে এমন কিছু ধাঁধা পাওয়া যায়, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় আছে।

মানুষকে নিয়েই আছে একটি অতি প্রাচীন ধাঁধা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এ ধাঁধাটি আছে, তবে আছে তা ভিন্ন পরিবেশন ভঙ্গীতে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের জীবনের গতি বিচিত্র। শৈশবে সে অসহায়, তখন সে চার পায়ে হামাগুড়ি দেয়, যৌবনে সে স্বাবলম্বী, তখন তার দুই পা, বার্ধক্যে তার শরীর হয়ে পড়ে অশক্ত, তখন তাকে নির্ভর করতে হয় যষ্টির উপরে।

এই চিন্তাটাকে ধাঁধার ভেতর দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে :

সকালে কে চারি পায়ে যায়?
দ্বিপ্রহরে হাঁটে দুই পায়ে?
তিন পায়ে চলে সন্ধ্যায়?

গ্রীক সাহিত্যে এটিই তো স্ফিন্‌ক্স-এর ধাঁধা। স্ফিন্‌ক্স নামে একটি রাক্ষসী পথের পাশে বসে প্রত্যেক পথিককে ধাঁধা জিজ্ঞেস করতো। উত্তর দিতে না পারলেই মৃত্যু। অবশেষে রাজা ঈডিপাশ এই ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজ্যকে রাক্ষসীর অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন।

এই ধাধাটিকে আরও অন্যভাবে বলা যায় :

প্রথমে চারটি পা
তারপরে দুটি.
শেষকালে তিন পা
হাঁটে গুটি গুটি।

দেহের বর্ণনা করা হয়েছে এমন ধাঁধাও লোকসাহিত্যে প্রচুর।

পৃষ্ঠ, মাথা, পা
কর্ণ আর নাসিকা
চক্ষু, দুই হাত, দশ আঙ্গুল নাই।
এমন কি জীব আছে, বল দেখি ভাই।

এখানে নাই যে নাভি সেটুকু ভুললেই মুশকিল এবং ধাঁধার ফাঁদে পা দেওয়া।

আমরা পাঁচ ভাই
এক সাথে খাই।
এই ধাঁধাটির উত্তর কি?

খাওয়ার সঙ্গে যখন পাঁচ ভাইয়ের সম্পর্ক, তখন এই পাঁচটি ভাই হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ছাড়া আর কি হতে পারে?

লোকসাহিত্যের বোধহয় সবচেয়ে ছোট, কিন্তু অর্থবহ নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ধাঁধাটি,

এই গেল, এই এল।

এই ধাঁধার উত্তর আমাদের দৃষ্টি।

লোকসাহিত্যে আমাদের দেহ সংক্রান্ত একটি খুব সুন্দর এবং প্রচলিত ধাঁধা আছে।

আসে একবার, যায় একবার, আসে আবার
কিন্তু আবার যে যায়, আসে না আর।

আমাদের দেহ সংক্রান্ত এমন কি আছে যা একবার আসা-যাওয়ায় পরে দ্বিতীয়বারেও আসে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের যাওয়াটা বরাবরের মত যাওয়া। এটি দাঁত।

মানব-শরীরের কথা বাদ দিয়ে তৈজসপত্র সংক্রান্ত একটি ধাঁধার কথা এবারে উল্লেখ করি। এই ধাঁধাটি পশ্চিমবাংলার সমস্ত অঞ্চলেই রীতিমতো প্রচলিত।

কলকাতাতে লাগল আগুন
তমলুক গেল পুড়ে,
কাঠখালি থেকে বেরুল ধোঁয়া
নারকেলডাঙ্গা ফুঁড়ে।

এই ধাঁধার উত্তর হুঁকো।

গাছপালা নিয়ে অজস্র ধাঁধায় গাছপালার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

আগায় থর থর গোড়ায় মৌ—কিসের?

এটিকেই অবশ্য অন্যভাবে বলা যায়:

দাড়ি চিকচিকে,
পাতা লিকলিকে;
মধুরস লাগে খেতে
চোপা আছে ফেলতে।

ধাঁধার উত্তর নিশ্চয় আখ।

আনারসও আছে লৌকিক ধাঁধায়। আনারস নিয়ে যত ধাঁধা তা বলা হয়েছে এইভাবে:

আশ্চর্য মহাশয়, বিশ্চার্য কথা
কোনখানে কে শুনেছে যে ফলের আগায় পাতা।

বা

বিধাতার একি কল
একটি গাছে একটি ফল।

আলুর বৈশিষ্ট্য কি?

ফল আছে, তার ফুল নাই।

কাঁঠালের স্বভাব ধরা পড়েছে নীচের ধাঁধাটির মধ্যে:

তেল চিক-চিক পাতা, ফলে ধরে কাঁটা
পাকলে মধুর মধুর, বীজ গোটা গোটা।

গাছপালা বা ফলমূল নিয়ে অজস্র ধাঁধা আছে। এইসব ধাঁধার ভেতর দিয়ে উদ্ভিদের বা তার অংশবিশেষের বা অনেক সময়ে তার ফল বা মূলের বৈজ্ঞানিক পরিচয় ধরা পড়ে।

সিঁদুরে টগমগ কাজলেরি ফোঁটা—কোন্ ফলের? কুঁচ ফলের।

ছুঁচ সম মাথা তার
করাত সম ধার।
কার?

নিশ্চয়ই কেয়া ফুলের।

ঝিঙ্গের বৈশিষ্ট্য কি?

দশ শির জন্ম তার নয় সে রাবণ
মেয়েদের হাতে তার নিশ্চয় মরণ।

বেল পাতা বা বেলফল কিরকম?

তিন একী পাতা তার সব ডালে কাঁটা।
খেতে লাগে মধুর যত, মুখে লাগে আঁটা।

লোকসাহিত্য থেকে আর একটি সুন্দর হেঁয়ালি তুলি :

পাকাও খাই, কাঁচাও খাই।
খেতে বললে চটে যাই।

কি এমন জিনিষ আছে যা পাকা খাই, কাঁচায় রান্না করেও খাই, কিন্তু খাওয়ার কথা বললেই চটে যাই।

কাঁচকলা ছাড়া এখানে আর কি হতে পারে ?

হেঁয়ালির সঙ্গে কবি কালিদাসের নামেরও যোগ আছে।

কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ
জানালা দিয়ে ঘর পালালো গেরস্থ রইল বন্ধ।

ব্যাপারটা পুরোপুরিই হেঁয়ালি মার্কা, কিন্তু চেষ্টা করলে এরও জট ছাড়ানো একেবারে অসম্ভব হবে না।

লৌকিক ধাঁধার ক্ষেত্রে গণিত জ্ঞাননির্ভর কিছু ধাঁধাও লক্ষ্য করা যায়।

সিকায় ছাগল, টাকায় গাই
পাঁচ টাকাতে মহিষ পাই।
কুড়ি টাকায় কুড়ি জীব
কিনতে পাঠাল সদাশিব।

তাহলে কটা ছাগল কেনা হল ? গাই আর মোষের সংখ্যাই বা কত ?

এখানে কেনা হল ষোলটি ছাগল চার টাকা দিয়ে, তিনটি মোষ, তার দাম পড়ল পনেরো টাকা আর একটি গাই এক টাকা। তাহলে সবশুদ্ধ পড়ল কুড়ি টাকা।

যদি বলি,

আছে যতো ভাসবে তত
তার অর্ধেক তার অর্ধেক
আপনাকে নিয়ে একশত।

তাহলে আছে কত জন ?

আছে নিশ্চয় ৩৬ জন। কারণ আছে ৩৬, আসবে ৩৬, আর ১৮ আর ৯ আর নিজের জন্যে ১, মিলে হল ১০০।

গাণিতিক আর একটি লৌকিক ধাঁধা বলি :

একটি বাঁধে কতকগুলি পদ্ম ফুল ফুটে আছে। অনেকগুলি ভ্রমর উড়ে গিয়ে বসল সেখানে। যদি দুটো করে ভ্রমর একটা ফুলে বসে, তাহলে একটা ফুল বেশি হবে, আর যদি একটা করে ভ্রমর একটা ফুলে বসে, তবে আবার একটা ভ্রমর বেশি হয়ে যাবে।

কতগুলি ফুল ছিল আর কতগুলিই বা ভ্রমর ?

চারটি ভ্রমর আর তিনটি ফুল নিয়ে সহজেই সমস্ত সর্ত মেলানো যায়।

লৌকিক ধাঁধায় গণিতের এইভাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও, বারোয়ারিতলায় গণিত কিন্তু সার্বজনীনতার আসন পায়নি। সাধারণ মানুষ, অর্ধশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের সংখ্যাই যাদের মধ্যে বেশি, দিনের শেষে আর পাঁচটা হালকা বিষয়ের বদলে গণিতের মত একটা জটিল বিষয়ের উপরে মন ঢেলে দেবে, তা স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সংখ্যার আর সাল, তারিখ, সনের ব্যবহার দেখা যায় অনেক সময়ে কবিতার ভেতর দিয়ে। একটি কাব্য কত সনে রচিত হয়েছে, কোন নৃপতি কোন্ সনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন—সাল, তারিখ, সনের এইরকম হাজারো প্রশ্ন আছে।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হইলেন শাহ গৌড়ের সুলতান।

কত সনের ঘটনা ?

সিন্ধু, ইন্দু, বেদ, মহী, এই চারটি শব্দ চারটি সংখ্যাকে বোঝায়।

সিন্ধুর সংখ্যা ৭, ইন্দু বা চন্দ্র ১, বেদ ৪ আর মহী ১। অঙ্কের বাম গতি, তাহলে সিন্ধু, ইন্দু, বেদ, মহী ১৪১৭ শকাব্দকে নির্দেশ করে।

সেই রকমভাবে মঙ্গলকাব্যের কালের হিসেব দেয় এ রকম আর একটা পদ তোলা যাক।

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী।

গ্রহ সংখ্যায় ৯, ঋতু ৬, কাল ৬ আর শশী ১। অঙ্কের বাম দিকে গতি নিয়ে গ্রহ, ঋতু, কাল, শশীর থেকে ১৬৬৯ শকাব্দ পাওয়া যায়।

লৌকিক ধাঁধার শেষ নেই, তার বৈচিত্র্যেরও পরিমাপ করা যায় না। লোকের মুখে মুখেই তার উদ্ভব, লোকের মুখে মুখেই সে ফিরছে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে, এক জেলা থেকে আর এক জেলাতে, যেন সে কত আটপৌরে, তার আভিজাত্য নেই, তার কৌলীন্য নেই। হয়তো ধাঁধার মধ্যে যে সূত্র দেওয়া আছে, তা অর্থহীন, অস্বচ্ছ, অসম্পূর্ণ, তার সঙ্গে উত্তরের যোগ অসম্ভব ক্ষীণ, তবু সে ধাঁধার একটি উত্তরই নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। কিন্তু সব লৌকিক ধাঁধা সেরকম নয়। কিছু কিছু লৌকিক ধাঁধা পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে, আছে একটা সত্যতা, একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। হয়তো বিষয়টা একেবারে ঘরোয়া, হয়তো হেঁসেলের উপকরণ তা, হয়তো দিদিমা ঠাকুমার শীতল-পাটি বিছিয়ে পা ছড়িয়ে ছোটদের গল্প বলার বিষয়, তবু ধাঁধার ভেতর দিয়ে যখন তা আসে, অবাক হয়ে তখন দেখতে হয় যে, একেবারে হেঁয়ালির মত সে নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে, সত্যতা আছে, তাৎপর্য আছে।

লৌকিক ধাঁধার মধ্যে সেই রকম ধাঁধার দিকেই আমাদের লক্ষ্য।